পথ-পুরাণ

পরিবেশক
প্যাপিরাস ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

উৎসর্গ

আমার চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী
মা ও শাশুড়ি-মাকে।

ভূমিকা

আমার অত্যন্ত সাদামাটা জীবন সম্বন্ধে দু'চার কথা হয়তো লিখতাম না, যদি-না আমার কিছু অন্তরঙ্গ সহকর্মীর তাগিদ থাকত।

তারাই আমার অনুপ্রেরণা।

তাদের মতে আমি নাকি ভালো বলিয়ে, অতএব কিছু লিখে এই বলাকে স্থায়িত্ব দেওয়া উচিত। আমি তাদের আস্থার উপযুক্ত না হলেও তারাই আমার নড়বড়ে মনোভাবকে কিছুটা ঋজু করেছে।

লিখতে বসে উপাদানের অভাব মনে করি। কারণ দেশে দেশে দিকে দিকে আমার কর্মধারা প্রবাহিত হয়নি।

বাড়ি থেকে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, মাঝে মাঝে স্বদেশে ইতিউতি ভ্রমণ, পরিণত বয়সে বাড়ি থেকে পরিচিত পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে যাওয়া নিশ্চয়ই দুঃসাহসিক কোনো অভিযান নয়। এই ছোট্ট জগতের লক্ষণরেখাতেই আমার জীবন-পরিক্রমা।

জানি না বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন হয়েছে কিনা। কিন্তু কিছু অসাধারণ চরিত্রের সান্নিধ্যলাভে আমি গৌরবান্বিত।

আমার কথায় তাঁদের অনিবার্য উপস্থিতি আমারই পরম প্রাপ্তি। বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মজীবনী পাঠককে আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে।

কারণ তাঁদের আত্মজীবনী এক রোমাঞ্চকর অভিযানের মতো। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উত্তরণের কাহিনী। কি মধুর সেই ফিরে দেখা! কিন্তু পৃথিবীতে অনামী ব্যক্তির সংখ্যাই বেশি। সিঁড়িতে পা না

রাখলেও পথ চলা তো আছে, আছে জীবনযাপনের দায়। এমন পথেরও পাঁচালী আছে।

আমার আত্মজীবনী ঠিক আত্মকথা নয়, আমার উপলব্ধিতে জীবনের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত, কিছু আনন্দ-বেদনার কোলাজ।

আমার এই লেখায় বিভিন্ন অধ্যায়গুলি কিন্তু ক্রমিক ঘটনাশৃঙ্খল নয়। প্রথম দুটি অধ্যায় যদিও এমনটিই আভাসিত করে। কিন্তু প্রথমে যে অধ্যায়টি লিখেছি তা' আমার প্রয়াত ছোটোবোনটির স্মৃতিমেদুরতায় আমার বাল্যকালকে অতিক্রম করে এক বেদনাহত দিদির দুঃখবেদনার উপলব্ধিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

এই উপলব্ধি একটি ছোট্ট মেয়ের নয়। দ্বিতীয় অধ্যায়টি তুলনামূলকভাবে লঘু। কিন্তু এটিও পিছু ফিরে দেখা নয়।

মানুষ তো সারাজীবন ধরেই 'বড়ো' হয়। আমার কর্মজীবন, গার্হস্থ্যজীবন এবং আমার অন্যান্য বিক্ষিপ্ত ভাবনাচিন্তাগুলি সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আমার এই অসংবদ্ধ চিন্তাভাবনাগুলিকে একটি গ্রন্থে সুসংহত করে প্রকাশিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন প্যাপিরাস প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার অরিজিৎ কুমার।

চন্দনা ভট্টাচার্য

সূচি

ভাইফোঁটা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের পারিবারিক ছবিটা ছিল অন্যরকম। পরিবার ছিল বিভিন্ন রকম সম্পর্কের Network এর এক অখণ্ড অনন্য গোষ্ঠী, যার একজন কর্তাও থাকতেন, গিন্নীও থাকতেন। এঁদের মধ্যে সবসময় অনিবার্যভাবে স্বামী-স্ত্রী সর্ম্পক থাকত না। কর্তাটি যদি প্রধান উপার্জনশীল ব্যক্তি হতেন, গিন্নী হয়তো বয়োজ্যেষ্ঠা সদস্যা। আবার কর্তাটি যদি দাপুটে দক্ষ পরিচালক হতেন, গিন্নী হতেন সংসারের অন্তঃপুর সামলানোর মতন কোনো শ্রীময়ী সুভাষিণী। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্তা-গিন্নীর একমাত্রিক দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিবার গঠিত হতো। এই সম্পর্কের আবর্তে উভয়পক্ষেরই কিছু আত্মীয় অন্তর্ভুক্ত হতেন। তাঁরা মিলেমিশে এমন একটি সাংসারিক পরিমণ্ডল রচনা করতেন যে সকলেই কিছু ভূমিকা পালন করতেন এবং কেউ-ই অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন না। এমনকি বাড়ির প্রধান ভৃত্য বা দাসীরও যথাযোগ্য সম্মান ছিল এবং সাংসারিক ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শও গ্রাহ্য হতো।

আমি এমনই একটি পরিবারে জন্মেছিলাম। আমাদের সংসারের গিন্নী ছিলেন পরিবারের প্রবীণতমা সদস্যা আমার দিদিমা। কলকাতার লেকমার্কেটে তাঁরই বিশাল অট্টালিকায় আমাদের পরিবারটির আশ্রয় ছিল। নিঃসঙ্গ দিদিমা তাঁর দুই অবিবাহিত পুত্রসন্তান নিয়ে আমাদের তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কারণ কর্মোপলক্ষে আমার

বাবাকে প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকতে হতো এবং আমার মা বোধহয় কলকাতাকে বাবার চাইতে বেশি ভালোবাসতেন। বাবার অবর্তমানে বিভিন্ন পরিজনের মধ্যে তাঁকে কখনো যক্ষপ্রিয়ার মতো উদাস হতে দেখিনি। বরং পুত্রকন্যার লালনপালন, দিদিমার স্নেহ, ভাইদের ভালোবাসা ও সংসারের আদুরে মেয়ের মতো দুরূহ জটিল সমস্যায় অসংলগ্ন থাকা তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথটিকে অনেক মসৃণ করেছিল। আমি আমার এই সুন্দরী সংস্কারমুক্ত মা-টিকে খুবই ভালোবাসতাম।

সমাজে কিছু চিরকালীন সংস্কার থাকে যা আমার মাতৃকেন্দ্রিক পরিবারটিকেও প্রভাবিত করেছিল। অভিজাত রায়বাহাদুরকন্যা দিদিমা তাঁর আদুরে মেয়েটির কন্যাসন্তানগুলির প্রতি যথেষ্ট স্নেহপ্রবণ ছিলেন, তাঁর দুই পুত্রের প্রতি তাঁর স্নেহের আধিক্য দেখিনি, তিনি অবতারের আবির্ভাবের মতো মায়ের পুত্রসন্তান জন্মানোর প্রতিক্ষায় ছিলেন এমন মনে হতো না। কিন্তু বংশধারাটি পুত্রই বহমান রাখবে এই স্থবির বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করবার মতো সাহসিকতা আমার মায়ের ছিল না। তাই পরপর কন্যাসন্তান জন্মানোর পরে আমার ভাই যখন জন্মাল, বাড়িতে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। তখন বাড়িতে আনন্দের ঘটনা ঘটলে প্রতিবেশীরাও তার অংশীদার হতেন। আমরা শিশুকন্যারা কেমন যেন হঠাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গেলাম। পিসিমা বললেন, 'এতদিনে বংশদুলাল এল।' বাবার মুখে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অলৌকিক আনন্দ। মা বললেন, 'এবার তোরা ছোটোভাইকে ফোঁটা দিবি—কেমন মজা হবে, না'? এমনকি দিদিমাও মেয়ের সুসম্পূর্ণ গরিমায় আত্মতৃপ্ত হলেন। আমাদের শিশু মনে একই সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দ। এই ছোটো সুন্দর শিশুটি আমাদের ভাই, একান্ত আমাদেরই, তবুও বিদেশি দামি পুতুলের মতো ওকে একটু আদর করে রেখে দাও, তোমরা ওর নিরাপত্তা বলয়ে অপটু পাহারাদার হতে

পারো কি? বোনেদের মধ্যে আমিই ছিলাম সব থেকে দুর্বল ও পরজীবি শ্রেণীর। আমাকে মা ভাত খাইয়ে দিতেন, দিদিমা চুলের দেখভাল করতেন, পিসিমা নারীর প্রস্তুতি পর্বটি সেরে ফেলার জন্যে আমার অত্যন্ত নরম কানে যন্ত্রণাদায়ক ফুটো করে দুল ঝুলিয়ে দিলেন, প্রবীণা দাসীটি আমাকে দিদির গরিমা সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর উপদেশ দিল, আমি অবুঝের মতো আমার এই আরোপিত পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পেলাম না। মায়ের আঁতুড়ঘরে ছোটো ভাইকে দেখতে গিয়ে যখন কোলে নিতে গেলাম, মা ধমক দিলেন—'তুমি কি পারো? ওর ঘাড় ভেঙে যাবে না? এখন একদম এদিকে আসবে না। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার আছে।' তারপর ঈষৎ কোমল গলায় যখন বললেন, 'আজ কার কাছে খেয়েছ?' আমার অভিমানের বাঁধ ভেঙে গেল। আমি কাঁদতে কাঁদতে আমার দিদির কাছে গেলাম। দিদি আমার কান্নার কারণ বুঝতে পারল কিনা জানি না, বলল—'আমি তোকে খাইয়ে দেব।' আক্ষেপ হলো আমি কেন দিদির মতো বড়ো নই, আবার ভাইয়ের মতো ছোটোও নই।

ভাইফোঁটার দিনে ভাইটিকে কোলে করে পিসিমা বসলেন ও কি করে ভাইফোঁটা দেব তার নির্দেশ দিলেন। আমরা ছোটো বলে আমাদের আয়োজনটি সংক্ষিপ্ত ও সরল করা হলো। আমার মায়ের ভায়েরা ও পিসিমার ভাই আমার বাবা ক্রমান্বয়ে এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আমরা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন সম্পর্কের নারীকুল একটি বিষয়ে একরূপতা অর্জন করলাম—আমরা এই অনুষ্ঠানের বৃত্তের পরিসরে থাকলেও কেন্দ্রবিন্দুতে নেই। এই বিরাট স্বার্থত্যাগের গরিমায় আমরা আলোকিত ও আনন্দিত—ও যে আমাদের ভাই, একান্ত আমাদেরই, আমরা ওকে আমাদের স্নেহের ছায়ায় বড়ো করে তুলব।

চরৈবেতি—চলমানতাই জীবন। ভায়ের পরে কয়েক বছরের

ব্যবধানে আমাদের সকলের ছোটো বোনটি জন্মাল। এই জন্মতে খুশির বান বইল না। মার শারীরিক অবস্থাও তখন খুব খারাপ। নিতান্ত অনুজ্জ্বল এই জন্মের শিশুকন্যাটিই আনল আমাদের সংসারে নিঃশব্দ বিপ্লব। আমার ভাইফোঁটা-সংক্রান্ত যাবতীয় ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে আমার এই ছোটোবোনটি এক অত্যুজ্জ্বল আলোকের আবর্তে বিরাজিত। সে একটি Phenomenon—যাকে তুচ্ছ করা যায় না, বরং যার চিন্তাভাবনার শরিক হলে নিজেকেও কেমন বিপ্লবীর গরিমায় আপ্লুত হতে হয়।

শিশু থেকেই আমার এই বোনটি অত্যন্ত জেদি, দাপুটে এবং অবহেলাকে অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে প্রত্যয়ী ও নিরভিমান। ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে সে তার ছোটো দাদাটির পাশেই বসে পড়ত। 'তুমিও বোন, দিদিদের মতো তুমি ওকে ফোঁটা দেবে, একসঙ্গে বসবে না'—এইসব নির্দেশ ও অবহেলায় অগ্রাহ্য করে বলত—'আমি এখানেই বসব, আমারও ফোঁটা চাই।' আমরা বোনেরা ও পরিবারের বড়োরা তার এই ব্যবহারে আশ্চর্য হতাম না, ছেলেমানুষের আবদার ভেবে কৌতুক বোধ করতাম। বোনটি কিন্তু তার অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হতো না, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে যেন তার আদেশ পালন করতে বাধ্য করত। বয়সের ব্যবধানেও তার এই ব্যবহারের কোনো পরিবর্তন আসেনি।

আমাদের সমাজে কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই ছেলেদের মেয়েদের থেকে বড়ো করে দেখার প্রবণতা আছে। মেয়েরাও এই ভাবনার শরিক। সংসারে নারী-পুরুষের আলাদা অবস্থান থাকবেই—কিন্তু বৈপরীত্য ও বৈষম্য এক ব্যাপার নয়। একটা স্বাভাবিক—আরেকটি কৃত্রিম ও আরোপিত।

এই বৈষম্য শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুচতুর সৃষ্টি নয়, বরং নারীকুলের বোধহীন আত্মনিবেদন। যদি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা

না থাকে, তবে অন্যতে এই শ্রদ্ধা ও আস্থা আরোপিত হয়। অশিক্ষিত অনগ্রসর গ্রাম্য সমাজে প্রধানত অর্থনৈতিক কারণে নারী পুরুষের দাসত্ব করে। কিন্তু সভ্য সুশিক্ষিত স্বচ্ছল শহুরে সমাজও. এর ব্যতিক্রম নয়। কন্যা সন্তানেই সন্তুষ্ট স্বেচ্ছায় গর্ভসম্ভাবনাকে বিলোপ করেছেন এমন নারীও কিছু আছেন, এমনকি স্বেচ্ছায় সন্তানহীন জীবনকে বেছে নেওয়া নারীও দুর্লভ নন—কিন্তু এঁদের সংখ্যা এঁদের মূল স্রোতের বাইরেই রাখবে। জোর করে নারীর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিছু এলেবেলে ব্যাপার হয়েছে। যেখানে 'শৈশব' শব্দটিতেই আছে এক মুক্ত আকাশের ব্যাপ্তি, সেখানে 'ছেলেবেলা' বা 'মেয়েবেলার' লড়াই কেন? প্রসঙ্গত বলে রাখি আমি তসলিমা নাসরিনের অনুরাগী হয়েও তাঁকে 'দ্বিখণ্ডিত' দেখতে চাই না। কিন্তু আমি নিতান্ত অল্পজ্ঞ সাধারণ এক নারী আমার মতামত গ্রাহ্য করার দাবি আমার নেই। কিন্তু আমার উপলব্ধিকে উন্মুক্ত করার কোনো বাধা আছে কি?

যাই হোক, আমাদের বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান আমার ছোটোবোনের ক্ষেত্রে কোনোবারই প্রতিবাদহীন হয়নি। তার আপোসহীন মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার করে এই অনুষ্ঠানের কিছু রদবদল হয়েছে। যেমন প্রতিটি বোনের জন্য আলাদা উপহার ও মিষ্টির বাক্স এবং ভাইবোনেদের একত্রে অন্নগ্রহণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা যতটা আরোপিত, ততটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এ যেন বিজয়ীর কাছে বিজিতের নিরুপায় আত্মসমর্পণ।

এই ছোটোবোনটি যখন স্বনির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করল—বাড়িতে কোনো প্রতিবাদ উঠল না, বোধহয় মূর্ত প্রতিবাদের উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়তায় সকলেরই অস্বস্তি ছিল। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরেই সে উচ্চ রক্তচাপজনিত নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হলো। ক্রমে ক্রমে কিডনির কর্মক্ষমতা গেল—দৃষ্টিহীনতার দুঃসহ আক্রমণে তার

উজ্জ্বল কর্মজীবনে ছেদ পড়ল। কিন্তু তার নিঃসঙ্গতা তাকে পরাজিত ব্যর্থ হতে দেয়নি। দৃষ্টিহীন অবস্থায় সে ক্রমাগত অনুলেখকের সাহায্য নিয়ে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে। এর মধ্যে ভাইফোঁটার প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। আজ দু'বছর হলো সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ভাইবোনদের বয়সও বেড়েছে। পিসিমা, বাবা ও মামাদের মৃত্যু হওয়ায় ভাইফোঁটা এখন একব্যক্তি-কেন্দ্রিক। রোগজীর্ণ শরীরে ও পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত ভাইবোনেরা প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো নিজ পরিবার-কেন্দ্রিক ও নিরুপায়ভাবে নিজস্ব সমস্যায় সীমাবদ্ধ। আজও বাড়িতে ভাইফোঁটা হয় কিন্তু তা প্রথানুগ ও সাবেকি। কিন্তু এক বিপ্লবীর উজ্জ্বল চোখ যেন দিদিদের নীরব ভর্ৎসনা করে চলেছে। 'তোরা পারলি না, পারবি না।'

না, পারলাম না। প্রতিবাদের অপ্রিয় রাস্তা ছেড়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের প্রয়োজনে দূরে সমুদ্রতীরে চলে এসেছি। পায়ের তলায় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করি সেই অসাধারণীকে খুঁজে পাই না। কিন্তু আজ ভাইফোঁটার দিনে বুকের মধ্যে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মধ্যবয়স্ক ভাইটির জন্য ব্যথা অনুভব করি। তুই কেন ছোটো রইলি না? তুই কি তোর দিদির কোনো অভাব অনুভব করিস? তোর ব্যস্ত জীবনে দীর্ঘশ্বাস ফেলারও সময় হয়তো নেই। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে এক প্রতিবাদী বিপ্লবীর ভর্ৎসনা শুনতে পাই,—পালিয়ে এলি? এখনও ভয়?

কখন মানুষ হবি?

না, জীবনসায়াহ্নে এসেও মানুষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলাম না। তার জন্য কোনো তাগিদও অনুভব করি না। যে সোজা পথে হেঁটে এসেছি সেই পথ ধরেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেব। সাংসারিক কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠাবতী নারীর সুনাম কেন এক ছন্নছাড়া দুষ্টু মেয়ের জন্য বির্সজন দেব? সে থাকুক আমার কাজের বাইরে,

সংসারের বাইরে, জীবনের বাইরে, উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো, সেখানে যেন নির্ভয়ে তার সঙ্গী হতে পারি।

এই বিদ্রোহিনী ছোটোবোনটি যখন চোখের অসুখে প্রায় দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে, তখন আরও একটি মারাত্মক দুঃসংবাদে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হায়! একি সমাপনের ইঙ্গিত। তার দুটি কিডনিই অকেজো হয়ে গেছে। অর্থাৎ অবধারিত মৃত্যু—শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিছুতেই মানতে পারছিলাম না ভাগ্যের এই পরিহাস! মনে শান্তি নেই, কোনো কাজে মনঃসংযোগ ঘটাতে পারছি না। অথচ জীবন থেমে থাকে না। সাংসারিক কাজ করছি, কলেজে অধ্যাপনাও অব্যাহত। কিন্তু কি চরম আনন্দহীনতায়! এমনই এক সময়ে কলেজে ছাত্রছাত্রীদের কিছু লিখতে দিয়ে এই কবিতাটি লিখেছিলাম। আমি কবি নই, কিন্তু একজন অনুভবী মানুষ। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে অলৌকিক শক্তি কামনা করছিলাম যা আমার ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেবে। ওকে বাঁচিয়ে রাখবে। একমাত্র কল্পনাই বাস্তবের রূঢ়তায় সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে পারে, তাই হয়তো কবিতা, এর কাব্যমূল্য না থাকলেও অনুভবের সত্যতা আছে।

আমার ইচ্ছা কিন্তু আমার ছোটো বোনটিকে বাঞ্ছিত জীবনদানে পূর্ণ হলো না। ১৮ এপ্রিল, ২০০১ সালের সকালেই তার দেহান্ত হলো। এই মর্মান্তিক ঘটনা আমার জীবনের এক turning point হলেও এর পরেও আমি ইচ্ছার কাল্পনিক সাম্রাজ্যে বিচরণ করি।

‘যদি’

যদি আমার ইচ্ছেটাকে নাম দেওয়া যেত
তবে তোমার নাম দিতাম ‘আয়ুষী’
তুমি আমার ছোটো বোন—

হয়ে যেতে চঞ্চল ছোটো মেয়েটি,
আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে ঘুরে বেড়াতে
এখানে-সেখানে,
দ্বিধাহীন নির্ভয় পায়ে।

যদি আমার ইচ্ছেটাকে নাম দেওয়া যেত,
তবে আমাদের স্বপ্নের বাড়িটার
নাম দিতাম 'নন্দন'—
যেখানে পারিজাত ফুলে ঢাকা বাগানে,
আমরা মায়ের কটি ছেলেমেয়ে,
জমাতাম পরিপাটি,
আমাদের চড়ুইভাতি।

মিথ্যে হয়ে যেত বয়সের বলিরেখা,
চুল, নখ, বিবর্ণ ত্বক ঘিরে
মৃত্যুর হাতছানি।
আমাদের খেলা হতো অফুরান—ক্লান্তিহীন,
ব্যাধিহীন নির্মেদ জীবন
এনে দিত স্বর্গের সৌরভ।

ইচ্ছে হয় ইচ্ছেটাকে বলি,
'তুমি সত্য হও
তোমার নাম দিই জীবন'।

যখন বড়ো হলাম

মানুষের বড়ো হওয়ার কি কোনো সময়সীমা আছে? কোনো কোনো ব্যক্তি অল্পবয়সেই যথেষ্ট বিজ্ঞতা অর্জন করে। Computer programming-এর মতো নির্ভুল ছক কষে গাণিতিক ফর্মুলায় অগ্রবর্তী জীবনটাকে ভেবে রাখে। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করে। তাদের জীবনে আবেগের চেয়ে বড়ো পরিকল্পনা, অবশ্য এই পরিকল্পনার রূপকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অভিভাবক, তাঁদের স্বপ্নপূরণের চাহিদা মিটিয়ে তারা মূল জ্যোতিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের কক্ষপথে অবস্থান করে। তারা বড়োই সুদূর, বড়োই নিপুণ, বড়োই সুসম্পূর্ণ। আমার বড়ো হওয়া নিছকই শারীরিক পরিবর্তন, সামান্য বুদ্ধির বিকাশ ও কিছু পরিমাণে বড়োদের আস্থা অর্জন করা ছাড়া অন্যরকম কিছু ছিল না। বয়ঃসন্ধির শারীরিক পরিবর্তনে আমার যতটা ভয় ছিল ততটা আবিষ্কারের আনন্দ ছিল না। যতটুকু বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল তা কঠিনতর পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর বিজ্ঞতা ছিল না। তখনকার দিনে অভিভাবকরাও এত সুচতুর, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সন্তানের সবটুকু নিঙড়ে নিয়ে তাকে পরিকল্পনামাফিক ঢালাই করতে পারতেন না। আমাদের বাড়িতে লেখাপড়ার প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ ছিল, নারীশিক্ষার ব্যাপারে কোনো Stigma ছিল না, কিন্তু যে যার ক্ষমতা অনুযায়ী বড়ো হবে বা মানুষ হবে এমন একটা ঢিলেঢালা মনোভাব ছিল।

আমাদের 'বড়ো হওয়ার' ধারণাটি মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করার ব্যাপারে যিনি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি আমার ছোটোমামা। কর্মোপলক্ষে বাবা প্রায়ই কলকাতার বাইরে থাকায় আমাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্বটি তিনিই নিয়েছিলেন। ঢিলেঢালা দিলদরিয়া বড়োমামা ছড়ি ঘোরানোর থেকে নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া ছোটোমামার সুগম্ভীর ব্যক্তিত্বশীল উজ্জ্বল উপস্থিতির পাশে তিনি বড়োই নিষ্প্রভ ছিলেন। আমাদের অন্তর উজাড়-করা স্নেহ বিতরণের জন্যই বোধহয় তাঁরা বিবাহ করেননি। আমরা এতটাই তাঁদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকু ছিল আমাদের জীবনে অনুশাসন পর্ব। ছোটোমামা তাঁর চরিত্রগুণেই আমাদের অঘোষিত অভিভাবক ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত সংস্কৃতিবোধসম্পন্ন অত্যন্ত সুপুরুষ এক তরুণ। তাঁর পক্ষে আমাদের মতো কচিকাঁচাদের ভার নেওয়া মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অথচ তিনি নিয়েছিলেন, এবং তাঁর কর্তব্যকর্মে কখনো বিচ্যুতি ঘটেনি। তিনি যখন আশুতোষ কলেজের এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র তখন অন্য ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে পাঞ্জাবে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর বড়ো সাধ হলো কুরুক্ষেত্র যাবেন এবং ঐ জায়গাটি শৌর্যবীর্য প্রদর্শনের পীঠস্থান কিনা পরখ করে দেখবেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি খানিকটা ঘুরেও এসেছিলেন, কিন্তু প্রশিক্ষণ না থাকায় ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর যে শারীরিক ক্ষতি হয়েছিল তা ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। তিনি প্রায়ই ভুগতেন। বিছানায় আশ্রয় নেওয়ায় তাঁর বহির্জগতের আকর্ষণ ক্রমক্ষীয়মাণ হতে হতে বিদায় নিল, তিনি হয়ে গেলেন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী এবং পরিবারকেন্দ্রিক। এই পরিবার তাঁর নিজের কিনা এটা তিনি আদৌ ভাবতেন না। আজ জীবন-সায়াহ্নে এসে আমাদের সেই মানুষ গড়ার কারিগরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম

জানাই। ভুলে যাই তাঁর কঠোর শাসন কোনো কোনো সময়ে অত্যাচার মনে হতো এবং তাঁর জমাটবাঁধা শীতল স্নেহবিগলিত করুণায় ঝরে পড়ুক আমাদের শুষ্ক রুটিন বাঁধা জীবনে এই আকুল কামনায় ভগবানকে স্মরণ করতাম। আমার মনে পড়ে আমার তখন আট-দশ বছর বয়স হবে। ছোটোমামার এক বন্ধু আমার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—বাঃ, বেশ বড়ো হয়েছে তো। ব্যস্—এইটুকু মন্তব্যই ছোটোমামাকে এত ক্রুদ্ধ করে যে তিনি তৎক্ষণাৎ আঙুল নেড়ে আমাকে স্থানত্যাগের নির্দেশ দিলেন এবং বন্ধুকে বললেন, 'তোর মেয়েটাও বোধহয় এতদিনে এইরকমটিই হয়েছে।' বন্ধুটি তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ কী বুঝলেন জানি না—কিন্তু এর পর আমাদের বাড়িতে তাঁকে কোনো উপলক্ষ ছাড়া আসতে দেখিনি। ছোটোমামাকেও তাঁর প্রসঙ্গ কোনোদিন উত্থাপন করতে দেখিনি। তাঁর তিরস্কারের নিগূঢ়ার্থ সেদিন আমার কাছে দুর্বোধ্য ছিল, কিন্তু আজ বুঝতে পারি নিশ্চয়ই শিশুশরীরে যৌনতার লুব্ধ উপলব্ধির আন্দাজ তিনি পেয়েছিলেন বলেই এতটা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। আজকের ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটিকে অত্যন্ত লঘুভাবে দেখবে, সৌন্দর্যের বিকাশ যে বয়সেই হোক তার প্রতি আকর্ষণে যৌনতার নাম-গন্ধ থাকবে না এটা ফ্রয়েডীয় থিয়োরির বিরোধী ও অত্যন্ত সেকেলে। আজকের ছেলেমেয়েরা আমার মামাকে হয়তো মনোবৈকল্যের শিকার ভাবতে পারে। তাঁর মনোভাবকে মানুষের বিকৃত শুচিবায়ুগ্রস্ততা ভাবতে পারে, কিন্তু তাদের ভাবনা মামার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটাতে পারবে না, কারণ আমি জানি আমার মামাকে আমিই বুঝতে পারি, স্নেহ কতটা গভীর হলে এতটা সর্তক হতে পারে তা বোঝবার ক্ষমতা এদের নেই। এরা অত্যন্ত আদরে লালিত হচ্ছে, যার মধ্যে যতটা প্রশ্রয় আছে ততটা শাসন নেই। একটি বা দুটি আদরের সন্তানের বিমুখতা

আমাদের কাম্য নয়। তাদের কাছে স্নেহ 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', স্নেহের এই সুলভ প্রাপ্তি তাদের পরিবারের প্রতি কতটা আকৃষ্ট করে জানি না, কিন্তু বহির্জগতের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী করে এই ব্যাপারে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু পরিবর্তন-শীলতাই জীবন—Reality is Elan Vital—আমাদের চিন্তাধারাও স্থবির কিছু মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকবে এটা সমর্থনযোগ্য নয়। তবুও আজ শাসনের বাইরে এসে উন্মুক্ত স্বাধীনতার আশ্বাসেও কেন মন ভরে না, কেন সেই পুরনো দিনের পাগলাটে মানুষগুলোর জন্য মন কেমন করে এর উত্তর মন-ই জানে। স্বতন্ত্র শরীরের মানুষগুলির মনও যে আলাদা। আমার সঙ্গে অন্যের চিন্তাধারার সাযুজ্য না থাকলেও ক্ষতি নেই, আমার শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের তাতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটবে না। এইবার অনুশাসন পর্বে ফিরে যাওয়া যাক।

অনুশাসন-পর্বের নায়ক আমাদের ছোটোমামাটি কয়েকটি নিরীহ ভীরু দুর্বল শিশুকে শাসন করেই শ্লাঘা অনুভব করতেন এমন ভাবলে তাঁর ব্যক্তিত্বের, তাঁর রুচিবোধের প্রতি সুবিচার করা হবে না। এটা ঠিক যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন তাঁর নির্দেশিকা অনুসৃত ছিল। আমাদের জ্ঞান যাতে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমিত না থাকে, জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিশাল সম্পদ যাতে আমরা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করতে পারি এর জন্য তিনি আমাদের নানারকম বই কিনে দিতেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বই ছিল 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড'। লেখক সম্ভবত ছদ্মনামে 'মৌমাছি'। সকাল বেলায় পরিচ্ছন্ন হয়ে ছাদের মুক্তবায়ু সেবনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বইটি থেকে সাধারণ জ্ঞানের দশটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের লিখতে হতো। বেশি প্রশ্ন আয়ত্ত করলে বোনাস মার্ক হিসেবে একটি কলম বা বীরবাহাদুরের ছবিওয়ালা লম্বা খাতা দিয়ে পুরস্কৃত করতেন। প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে সন্ধ্যাবেলার পড়ার সময়সীমা দশ মিনিট বাড়িয়ে দেওয়া হতো।

আমাদের এই ছাদ-কেন্দ্রিক প্রাতর্ভ্রমণ খুব যে একটা আনন্দদায়ক ছিল না বলাই বাহুল্য। কিন্তু ছোটোমামা সপ্তাহান্তে চিড়িয়াখানা বা যাদুঘরে আমাদের বেড়ানোর ব্যবস্থা করে আমাদের বিশুদ্ধ আনন্দলাভেও বঞ্চিত করতেন না। তিনি তাঁর স্বল্প সঞ্চয় থেকে 'আইভ্যানহো', 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' এইসব স্বল্পমূল্যের অনুবাদ সাহিত্য মেধা অনুযায়ী আমাদের উপহার দিতেন। এই পুরস্কার প্রাপকের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাগ্রে। বিদেশি সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করার আগ্রহটি তিনিই আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। এই আগ্রহ থেকেই ইংরেজি পাঠ্যবিষয় হিসেবে আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। নেসফিল্ডের গ্রামারের সঙ্গে সঙ্গে সহজ ইংরেজি ভাষায় লেখা বিদেশি সাহিত্যের বইগুলিও যখন পড়তে পারতাম, তখন এক অলৌকিক আনন্দে মন ভরে যেত। ছোটোমামা আমাদের শেক্সপীয়রের বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ অসাধারণ বিচিত্র রসসমৃদ্ধ লেখাগুলি ছোটোমামা অত্যন্ত স্বচ্ছ সাবলীলভাবে আমাদের কাছে গল্পের আকারে বলতেন। তাঁর অপূর্ব কথকতা আমাকে মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রোতার আসনে বসিয়ে রাখত। এই অনুরাগের ব্যাপ্তি আমার পাঠ্যবিষয়ের প্রতি সঞ্চারিত হয়েছিল যার ফলে ক্লাসে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জনে কখনো ছেদ পড়েনি। শুধু জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ সংগ্রহে তিনি যে আমাদের উৎসাহী করেছিলেন তা নয়। গীত-বাদ্যেও যাতে আমরা পারদর্শী হই সে ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। একটি হার্মোনিয়াম তিনি আমাদের কিনে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব একজোড়া তবলা ছিল। বাবার পরিত্যক্ত একটি মিনমিনে এস্রাজও আমাদের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান শেখানোর ব্যাপারে তিনি শেষের দুটিকে পরিত্যাগ করেছিলেন কারণ অপটু অসংস্কৃত শিক্ষানবিশীতে ঐগুলিকে তিনি বাহুল্য মনে করেছিলেন। যাই হোক তাঁর নিজের গীত ভাণ্ডারের

ব্যাপ্তি বিশাল ছিল না, খুব একটা সুগায়কও তিনি ছিলেন না। কিন্তু শেখানোর ব্যাপারে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি আধুনিক গান ভালোবাসতেন, 'মধুর আমার মায়ের হাসি', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূ' এই জাতীয় নিরীহ অথচ আবেগ সমৃদ্ধ গানগুলি তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন। আমাদের সুবিধা ছিল এই যে আমাদের শিক্ষক নিজেও ছিলেন অদক্ষ ও গানের ব্যাকরণের ব্যাপারে অজ্ঞানতার জন্যই নিস্পৃহ। তাই আমরা সুর তাল-লয়ের ব্যাপারে যথেচ্ছাচার করলেও শাসিত হতাম না, বরং আমরা যে কিছু চেষ্টা করছি এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই গান আমরা শিখেছিলাম না বলে জেনেছিলাম বলাই ভালো। তবুও গান শেখার ব্যাপারে আমাদের উভয়পক্ষের সানন্দ যোগদান ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এই ব্যাপারে ছন্দপতন ঘটাতেন আমার বাবা। তাঁর মিনমিনে এস্রাজে বেসুরো গলায় তিনি কিছু দেশপ্রেমমূলক সংগীতে আমাদের গলা মেলাতে বলতেন। যেমন—'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা' ইত্যাদি। কিন্তু স্কুলের প্রার্থনা সংগীতের মতোই এই গানগুলি বোধহয় বেরসিক সঞ্চালকের জন্যই আমাদের কাছে বিস্বাদ লাগত। বাবা হয়তো সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির গৌরবের আলোকে এতটাই আলোকিত ছিলেন যে অন্যতর কিছু তাঁর কাছে লঘু মনে হতো। এমনকি আমার সৌন্দর্য-সচেতন মা যদি কখনো অকারণে কাননবালা বা রবীন মজুমদারের গান গাইতে গাইতে আয়নার সামনে চুল বাঁধতেন তাহলে বাবার ভ্রুকুঞ্চন তাঁর অননুমোদন ব্যক্ত করত। মা অবশ্য এসব লক্ষ্য করতেন না বা গ্রাহ্য করতেন না। বাবা কিন্তু আমার দারুণ অভিমানী ছোটোমামার সাম্রাজ্যে কখনো অনধিকার প্রবেশ করতে চাননি। ছোটোমামার অকালমৃত্যুতে তিনি শিশুর মতো কেঁদেছিলেন বোধহয় এমন সু-অভিভাবক থেকে তাঁর শিশুসন্তানদের বঞ্চিত হওয়ার জন্য, অবশ্য মামাটির প্রতি তাঁর

শ্রদ্ধামিশ্রিত অকপট ভালোবাসাও ছিল। ছোটোমামার মৃত্যু যে শূন্যতা আমাদের এনে দিল, যে অসহায়তায় আমাদের আচ্ছন্ন করল—সেই দুঃখবোধের দর্শন থেকেই আমরা নিজেরা বোধহয় বড়ো হতে শিখলাম।

জীবমাত্রই প্রাকৃতিক নিয়মেই ছোটো থেকে বড়ো হয়। জীবনের বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহে কত কী ঘটে—তার সঙ্গে মানুষের বয়োবৃদ্ধির কোনো অনিবার্য সংযোগ নেই। কিন্তু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতায় আমাদের অলক্ষ্যেই যেন আমরা স্তরে স্তরে পরিবর্তিত হতে থাকি। এখন খেলনা-পুতুল নিয়ে আর বায়না নেই, কিন্তু নির্বোধের মতো সোনার হরিণের বায়না থাকলেও থাকতে পারে। আমারও এমনটা হয়েছিল। কিন্তু তার প্রেক্ষিত সম্বন্ধে আলোচনার একটি পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হবে না। কারণ যা আমার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব, তার সঙ্গে প্রচলিত ধারণার সাযুজ্য না-ও থাকতে পারে। না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ আমি ব্যতিক্রম না হয়েও আমার সমবয়সীদের থেকে একটু অন্যরকম ছিলাম। নিজের সম্বন্ধে ফিরে দেখা যদি (নির্মোহ) Objective পর্যালোচনা হয়, তবেই আত্মজীবনী হতে পারে আত্ম-আবিষ্কার। নিছক বিশেষ সময়ের বিশেষ স্থানের বিশেষ পরিবারের Documentation নয়।

কৈশোরের প্রথম প্রকাশে আমি বোধহয় একটু দেখার যোগ্য হয়ে উঠেছিলাম। নিজেকে দর্শনীয়ভাবে উপস্থিত করার ইচ্ছে থেকে আমার মধ্যে একটু বিষণ্ণতাবোধ এসেছিল। কারণ আমাদের বাড়িতে মামার পথ অনুসরণ করে বাবাও কৃচ্ছ্রসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই নিজেকে সাজাবার উপকরণের অপ্রাচুর্য আমাকে ক্ষুব্ধ করত। ট্যালকম পাউডার, স্নো, কুমকুম এবং উৎসবে ফেস পাউডার ও কাজল—আমাদের এতেই তৃপ্ত থাকতে হতো। অবশ্যই তৃপ্তির পরিবর্তে ভাগ্যবতী বান্ধবীদের প্রসাধন সম্ভার দেখে নিজেকে কেমন দুঃখী ও

বঞ্চিত মনে করতাম। বন্ধুর দিদির বিয়েতে যাওয়ার সময় আমার এই সাজ-সরঞ্জামের দৈন্য আমাকে বিশেষভাবে দুঃখিত করল। আমি মায়ের কাছে একটি লিপস্টিকের আবদার করলাম। মা ক্রুদ্ধ হলেন না, বরং মোলায়েম গলায় আমাকে লিপস্টিকের অনাবশ্যকতা বুঝিয়ে বললেন, 'লিপস্টিক মাখা ভালো নয়। ওতে বেশি সুন্দরও দেখায় না। দেখ না, আমি আজ নিজেই তোমাকে সাজিয়ে দিচ্ছি।' যেমনি বলা অমনি কাজ। আমাকে প্রতিরোধের কোনো অবকাশ না দিয়ে মা ভালো করে আমার মুখ পরিষ্কার করে স্নো পাউডার মোলায়েম-ভাবে লেপন করলেন। চোখে কাজলের রেখা, কপালে কুমকুমের পাশে পাউডারে গোলা লবঙ্গের আলপনা। চুলে একটি বেণী, সিঁথির দুই পাশে প্রজাপতি মার্কা হেয়ার ক্লিপ। যে জামাটি পরেছিলাম সেটিকেই ব্লাউজ-কাম-পেটিকোট বানিয়ে পরিয়ে দিলেন তাঁর নিজের শৌখিন বেনারসী। হাতে-গলায় টুকিটাকি গয়না, ব্যস্—You are ready for the show ! কি আর করা যায়।

ঐভাবেই বন্ধুদের সঙ্গে লজ্জিতভাবে উৎসবগৃহে গেলাম। আশ্চর্য—আমার দিকে সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। মায়ের ছোঁয়ায় নিশ্চয়ই কোনো অলৌকিক যাদুদণ্ড আছে। আমি আমার মনোবেদনা শীঘ্রই ভুলে গেলাম। বাড়ি এসে মায়ের সিন্দুর পরা স্নেহময়ী মুখটিতে আমি যেন স্বর্গীয় পবিত্রতা আবিষ্কার করলাম। সে যুগে টিভি ছিল না, বিউটি পার্লার ছিল না, কসমেটিকের প্রাচুর্য ছিল না—তাই হয়তো মানুষ সাদামাটাভাবেই সবকিছু দেখত। আমিও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। এখন প্রবীণ বয়সেও নিজেকে সাজানোর ইচ্ছে মরে যায়নি, উপকরণের প্রাচুর্যে ঘাটতি নেই, এই পড়ন্তবেলাতেই সুসজ্জিতা হলে আমি নিজেকে নিয়ে গর্বিতাই হই, তবুও অকারণ একটি অপরাধবোধ আমাকে তাড়া করে—এতটা না সাজলেই হতো, এটা বোধহয় অবচেতন মনে Super-egoর নৈতিক অনুশাসনের

ফল। আসলে শৈশবে যে Ethos আমাদের মনের মধ্যে তৈরি করে দেয় তার থেকে পালাবার পথ নেই। আজও আমার মৃত ছোটোমামা ও বাবা কি দাপটের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মকে শাসন করে চলেছেন তাতে অনেক চেঙ্গিস খান ও সুলতান মামুদের গরিমা ম্লান হয়ে যায়। সংস্কৃতির এই নৈতিক অনুশাসন হতভাগ্য ছিন্ন-ভিন্ন দেশটাকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। কোনো মারণ-যজ্ঞেই আমরা নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাব না—তা সে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মারণাস্ত্রের আক্রমণ যাই হোক না কেন? চুলোয় যাক জর্জ বুশ আর বিন লাদেন আর যত হাল্লা রাজার দল! আফগানিস্তানের ছেলেরা আজ কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসেছে, খোদ আমেরিকাতে শান্তির জন্য আকুল আবেদন 'বাদশাজাদার তন্দ্রা ছুটিয়ে' দিচ্ছে। আর সর্বগ্রাসী হতাশার মধ্যেও ভারতের গণতন্ত্র কী ভীষণভাবে জীবিত।

'সোনার হরিণ' চাওয়ার ব্যাপারটিকে লঘুভাবে দেখতে হবে। অসম্ভবকে মানুষ চাইতে পারে না, বিশেষ করে যখন তার বোধশক্তির বিকাশ ঘটছে। তাছাড়া চারিদিকে অনুশাসনের লক্ষণরেখাকে অগ্রাহ্য করার স্পর্দ্ধা কি করে হবে! নিতান্ত আটপৌরে জীবনে কীভাবে আমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলির ক্রমিক পরিবর্তন ঘটল, বিয়েবাড়ির ঘটনা তারই উপক্রমণিকা মাত্র।

মানুষ সোনার হরিণ তৈরি করতে পারে, কিন্তু তাতে প্রাণ দিতে পারে কি? প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কিছু প্রত্যাশা থাকে। এই প্রত্যাশার চরিত্রটি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। কিন্তু তবুও মানুষ কুহকিনী আশার পিছনে ছোটে, নিজের অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করবে এমন প্রাণপ্রতিমা গড়ে তোলে। এই প্রাণপ্রতিমা বয়সভেদে আলাদা। যৌবনের অঙ্কুরোদ্গমে আমার এই সোনার হরিণটি আমার ভাবী সঙ্গী এক ঈশ্বর—যার মধ্যে সব কাঙ্ক্ষিত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। এই ঈশ্বর আমার চারপাশে পরিচিত মানুষগুলির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অসম্পূর্ণভাবে ছিলেন। যদি কেউ বুদ্ধিমান হন তবে হয়তো তাঁর মধ্যে শৌর্যের অভাব, আবার বলবান ম্যাচো ব্যক্তিটি নিরেট ও হাঁদা। কালিদাসের 'রঘুবংশম্' কাব্যে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভাটির বর্ণনা বড়োই সুন্দর—যেখানে একে একে রাজন্যবর্গ পছন্দসই না হওয়াতে প্রত্যাখ্যাত হলেন, কিন্তু অবশেষে এক সোনার হরিণ মিলল। কাব্যে হয়তো মেলে, বাস্তবে মেলে না। এমনকি যাঁকে আপাতদৃষ্টিতে সর্বগুণান্বিত মনে হয় জীবনের দৈনন্দিনতায় তিনিই হয়ে যান নিতান্ত একঘেয়ে ও নীরস। যে খেলোয়াড়টির আমি গুণমুগ্ধ, বাস্তবে দেখলাম তিনি আপাদমস্তক একটি বাণিজ্য। সে অভিনেতা আমার স্বপ্নসঙ্গী বাস্তবে তিনি এক প্রাণহীন মানুষ, যিনি সিনেমাতে ও বাস্তবজীবনে শুধুই 'ডায়ালগ' বলেন। যে কবিটির আমি অনুরাগী পাঠিকা, বাস্তবজীবনে তিনি অগোছালো পোশাক-পরা উদ্ভট গিমিক-সর্বস্ব কোনো লালিমা পাল (পুং)। যে অধ্যাপক তাঁর মেধাদীপ্ত বাগ্মিতায় মুগ্ধ করেছেন, বাস্তবজীবনে তিনি কেরিয়ার সর্বস্ব এক রোবট। জীবন যতই অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ হতে থাকল, আমার সোনার হরিণের ছবিটি পরিবর্তিত হতে হতে অবশেষে একটি সাধারণ মানুষে পরিণত হলো, যাঁর কোনো Larger than life গরিমা নেই, কিন্তু জীবনের দৈনন্দিনতায় যিনি উপভোগ্য ও মানানসই। আমি যে এই পুরুষটিকেই পেয়েছি এমন কথা হয়তো বলা যায় না—কারণ কেউ-ই সেভাবে সম্পূর্ণ মনের মতো হতে পারে না—কিন্তু বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও যাঁর সঙ্গে একটি সুখকর বোঝাপড়া থাকে, তাঁর সঙ্গে জীবন কাটানো যায়। এই জীবনে আমার কোনো বিচ্যুতি ঘটেনি, মুগ্ধতা স্থানান্তরিত হয়নি, বাউল মন উদাসী হয়নি—এমনটি নয়। কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার নোঙর বেঁধেছি নিরাপদ পোতাশ্রয়ে—সে যে আমার বড়োই চেনা, বড়োই প্রয়োজনীয়, বড়োই একনিষ্ঠ। 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে' তবে কি ঘটত বলা যায় না, কিন্তু এযুগের

একটি যুবতী কখনোই আমার মতো ভাববে না একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নত আবহে সে বোতাম টিপেই সব তথ্য জেনে যায়, তার কল্পনার কোনো অবকাশ নেই, আমার অর্থহীন রোমান্টিকতায় তার কোনো আগ্রহ নেই। তাই বড়ো হয়েও বুড়ো হলাম না, 'সোনার হরিণ'টি এখনও ইতিউতি উঁকি মারছে।

আমরা যতই বড়ো হই, আমাদের মা-বাবাও ততই বুড়ো হতে থাকেন। এই বড়ো হওয়ার মধ্যে একধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, নার্সিসিজম্ বলা যায়, যাতে মা-বাবার ভূমিকা ক্রমশই গৌণ হয়ে পড়ে। তাঁরা আমাদের চেতনায় থাকলেও কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন না। কিন্তু তাঁরা তো কখনোই হারিয়ে যান না। ঘটনার অবাধ প্রবাহমানতায় যখনই কোনো পরিবর্তন আসে, আমরা আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে তাঁদেরই নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি।

'বড়ো ভুল হয়ে গেছে,' 'বড়ো দেরি হয়ে গেছে'—এই অপরাধবোধ আমাদের পীড়িত করে। তাঁদের মৃত্যুতে আমরা তাই কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাই না। আমার বাবা ছিলেন একজন কর্তব্যপরায়ণ পিতার archetype. পিতৃসুলভ গাম্ভীর্য কিন্তু কখনো কখনো সন্তানদের অসুখ-বিসুখে আবরণমুক্ত হয়ে স্নেহের নরম আলোয় প্রকাশিত হতো। তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লেও তিনি শয্যালগ্ন হননি। তাই তাঁর মৃত্যু সম্ভাবনার কথা মনে আসেনি। একাকী তিনি যখন টিভি বা খবরের কাগজে হয়তো অর্থহীনভাবে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করতেন, আমি তখন গৃহস্থ কর্ম সেরে বাপের বাড়িতে পারিবারিক আড্ডাটুকু উপভোগ করতাম। আজ নিজের নিঃসঙ্গতায় কেমন অপরাধবোধে ভুগি। যদি একটু বাবার জন্য সময় দিতাম! একটু তাঁর কাছে বসতাম! স্বল্পভাষী এই মানুষটি নিজেকে অভিমানী দূরত্বে অপ্রকটিত রাখতেন, কিন্তু সন্তান হিসেবে আমার উপলব্ধি যদি

তাঁর হৃদয় ছুঁয়ে দেখত! তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় এই কবিতাটি লিখেছিলাম এক অপরাধবোধের গ্লানিতে। সরকারি অফিসার হওয়ায় বাবা ঔপনিবেশিক আভিজাত্যের প্রতিফলন কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মধ্যেই খুঁজে পেতেন। বোধহয় তাঁর ঈপ্সিত ইংরেজি ভাষার একটি পরীক্ষা দিলাম এই কবিতাটিতে—নতুবা ভাব ও ভাষার দৈন্য আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করত। আমি মাতৃভাষার প্রতি সশ্রদ্ধ—কিন্তু ইংরেজির বিষয়ে সকুণ্ঠ। এই কুণ্ঠা ও লজ্জার আবরণ বোধহয় আমার প্রয়োজন ছিল।

TO MY FATHER, AN APOLOGY

When you longed to see me
I did not care,
Thinking the meeting can wait
But my work cannot
I would rather see you later.

Now you are gone,
There are still so many works
for me to do,
But they can wait,
you cannot.

I have still now so many things to care
And so many persons to care for me,

But there is not one,
Who will sit close to my sick-bed,
And put his gentle and loving hand
on my forehead,
and say, "my daughter, you are over-worked, take rest."

I know my journey too will be over
        and I will take rest

And we all die with the sure hope
for resurrection to the eternal life
        But this eternity is an impenetrable darkness.

Where I will hover here and there
        And never find you.

আমার কর্মজীবন

লেখাপড়া শিখে আমি চাকুরিজীবী হব এমন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আমার মা-বাবার ছিল না। তাঁরা তাঁদের মেধাবী মেয়েটিকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন, কিন্তু সে অর্থোপার্জন করে সংসারকে সমৃদ্ধ করুক এমন চিন্তা তাঁরা করতেন না। বরং আমি গবেষণা করি, বিদেশে যাই এমন আশাই তাঁরা করতেন। এই সমৃদ্ধির অনুযঙ্গ হিসাবে একটি সুপাত্রে আমি স্থিতবতী হই ও মসৃণভাবে আমার সারস্বত সাধনা সাংসারিক পরিমণ্ডলে আরও সম্পূর্ণতা পাক, এমনটিই তাঁরা আশা করতেন। কিন্তু আমার চিন্তা ছিল অন্যরকম। ইউনিভার্সিটির ছাত্রীজীবনে আমি পড়াশুনা ছাড়াও অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হলাম। আমি প্রেমে পড়লাম। প্রেম গাঢ়তর হতে থাকল এবং অসহিষ্ণুভাবে আমরা উভয়েই ডিগ্রি আয়ত্ত করে চাকুরির প্রতীক্ষায় রইলাম। আমাদের বিবাহের পথটি মসৃণ নয়, এইজন্যই সাংসারিক নিরাপত্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেকটি সংসার গড়তে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সবথেকে বেশি এটা উপলব্ধি করেছিলাম। জীবিকা হিসেবে অধ্যাপনা আমার কাছে প্রিয় ও কাম্য ছিল এবং কলকাতার একটি কলেজে আমি সহজেই কাজ পেলাম। মামুলি সাদামাটাভাবে আমার কর্মজীবন শুরু হলেও এর বিচিত্র বর্ণময় অভিজ্ঞতা আমাকে যে কতভাবে সমৃদ্ধ করেছে তার উল্লেখ না করলে আমার এই আত্ম-অন্বেষণ অসত্য, অপূর্ণ ও অর্থহীন হবে। আমার কর্মজীবনই আমার জীবনে সবথেকে

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই কর্মজীবনের দীর্ঘ পরিব্যাপ্তি আমাকে ভেঙেছে গড়েছে, নির্মাণ-বিনির্মানের দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে আমাকে সমৃদ্ধতর, পূর্ণতর এবং অনেক অনেক বেশি বাস্তব-সচেতন করেছে। আমার অলক্ষ্যে কখন আমার কর্মভূমি আমার ঘর-সংসার হয়ে গেছে জানি না। আজ অবসৃতা হয়ে এর প্রতি আরো সংশ্লিষ্ট, আরো আকৃষ্ট, আরো আবেগ অনুভব করি। আজ শারীরিকভাবে না থেকেও কী ভীষণভাবে আমার প্রিয় কলেজের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছি তা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। আমার এই অনুভূতি স্বজ্ঞালব্ধ সত্যের মতোই স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ।

অথচ বিজয়গড় কলেজে আমার কর্মজীবনের প্রথম দিনটির অভিজ্ঞতা মোটেই রোমাঞ্চকর ছিল না। আমি লেডি বেব্রোর্ণ কলেজে পড়েছি তার স্বর্ণোজ্জ্বল সময়টিতে। শুধু কলেজের চেহারা যথেষ্ট আকর্যক ছিল তাই নয়, প্রথম শ্রেণীর একটি কলেজে যা যা থাকা দরকার সবই ছিল। ফুল-ফোয়ারা শোভিত বিরাট বাড়িটিতে কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই, অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পরিচালনায় কোথাও গোলমাল নেই, ছাত্রী-শিক্ষক সকলের ভাষাই অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত, তাতে আবার ইংরেজির প্রলেপ পড়ায় আমাদের কাছে আভিজাত্যপূর্ণও মনে হতো। কোথায় লেডি ব্রেবোর্ণের ঔপনিবেশিক শিল্পশৈলী, আর কোথায় আমার বিজয়গড় কলেজের হতশ্রী মেঠো চেহারা। বিজয়গড় অঞ্চলটি তখন যথার্থই শহরতলি ছিল, মেঠো রাস্তায় সাইকেল রিক্‌শাই একমাত্র যানবাহন, বাস-স্ট্যান্ড এবং যাদবপুর স্টেশন থেকে বেশ দূরেই তার অবস্থিতি উদ্বাস্তুপ্রধান কলোনী অঞ্চলে। কলেজের বাড়িটি একটি পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাক। টিনের চালার অত্যন্ত গ্রাম্য ধরনের আর আকৃতি দেখে আমার চোখে জল এল। তাতে আবার বেশিরভাগ লোকেই পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলছে! কলেজটিতে সহশিক্ষা ছিল, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা নেহাত কম নয়!

কলেজের দায়িত্ব ছিলেন তৎকালীন ভাইস-প্রিন্সিপাল সমর চৌধুরী, কারণ প্রিন্সিপাল অমিয় চক্রবর্তী তখন সাসপেনশনে ছিলেন। যাই হোক, সমরবাবুই আমাকে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা এই শহুরে যুবতীটিকে সাদরেই গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাতে আমার বিষণ্ণতা কাটল না। স্টাফরুমটি দেখে আমার হতাশা আরও বেড়ে গেল। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ঘরে ঠাসাঠাসি করে কয়েকটি ভাঙাচোরা চেয়ার। ঝুলওয়ালা দেওয়ালে একটি বিবর্ণ ক্যালেন্ডার এবং একটিমাত্র জানলার কাছে পুরনো সস্তার মীটসেফে কিছু সস্তার কাপ-ডিশ সাজানো। ক্লাসের অবসরে এই ঘরটিতে আশ্রয় নিতে হবে ভেবে আমার কর্মজীবনের রোমাঞ্চকর কল্পনায় বিরাট ছন্দপতন ঘটল। আমি দর্শনবিভাগের অধ্যাপিকা, অন্য বিভাগে আমি সমবয়সী দুই তিনজন নারীকে অধ্যাপনায় নিযুক্ত দেখলাম। তাঁদের চেহারায় শহুরে পালিশ থাকলেও তাঁরা নতুন মেয়েটিকে স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করলেন না। এই দূরত্ব রচনাও এক ধরনের র‍্যাগিং মনে হলো। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, যে শহুরে শিষ্টাচারের জন্য আমি তাঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হতে পারিনি, সেই একই কারণে হয়তো তাঁরা গোমড়ামুখের এই মেয়েটিকে বিব্রত করতে চাননি। পরবর্তীকালে এই অপরিচয়ের বাধা কাটিয়ে আমরা কেমন আপন হয়ে গিয়েছিলাম তা ভাবলে আজ আমার প্রথম দিনে তাঁদের সম্বন্ধে আমার ধারণার জন্য নিজেকে অপরাধী ও লজ্জিত বোধ করি।

অধ্যাপনার জড়তা কাটিয়ে আমি অতি সহজেই ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করেছিলাম। আমার ক্লাসে তারা ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাগ্রহী। এর জন্য একটু আত্মপ্রশংসা করতেই হয়। পড়ানোর ব্যাপারটিকে আমি নীরস বক্তৃতায় আবদ্ধ না করে পারস্পরিক আলোচনার এক উন্মুক্ত পরিবেশে পরিব্যাপ্ত করেছিলাম। তারা যেন

আমার সহপাঠী, কিছুটা পড়িয়ে আমি সাগ্রহে বিষয়টি তারা কি বুঝেছে জানতে চাইতাম, তারা তাদের উপলব্ধিকে সহজেই প্রকাশ করত, আমিও এই উপলব্ধির মূল কাঠামোটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে একটু পরিমার্জন করে বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করতাম। এতে তাদের অল্পজ্ঞের কুণ্ঠা থাকত না, আমারও জ্ঞানের গরিমা প্রকাশ পেত না। শিক্ষা ব্যাপারটিতে ভাবের আদান-প্রদান না থাকলে তা একপেশে ও নীরস কথামালা হয়ে যায়। আমি দর্শনের ছাত্রী, গ্রীসের মার্কেট প্লেসে সক্রেটিসের অনন্য dialectic পদ্ধতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কেউ কাউকে কিছু আনকোরা নতুন শেখাতে পারে না, কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ জ্ঞানের জগতে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, সকলেই সব কিছু জানে—অস্পষ্টতাই অজ্ঞানতার ছদ্মবেশ ধরে। শিক্ষক স্বপ্রকাশ জ্ঞানের জগতের মেঘের আবরণটিকে সরিয়ে দেন মাত্র। কিন্তু আমি বোধহয় নিজের কথা থেকে সরে এসেছি। আসলে শিক্ষকতার সঙ্গে একাত্ম থাকায় আমার কর্মজীবনের সারধর্ম আমার শিক্ষাভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। এতে বোধহয় আমার ব্যক্তিত্বের পরিধি সঙ্কুচিত হয়েছে, কিন্তু নিজের এই ক্ষুদ্রতায় আমি আদৌ লজ্জিত নই। বরং পেশা ও ভালোবাসার এই সহাবস্থানে আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনে আমি কখনো ক্লান্তি বোধ করিনি।

কলেজে যোগদানের অল্পদিনের মধ্যেই প্রিন্সিপাল অমিয় চক্রবর্তী ফিরে এলেন। তাঁকে প্রথম দেখেই আমার মনে হলো—বাপরে! কি দাপট! ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, আভিজাত্যপূর্ণ পরিশীলিত ব্যবহার, জ্ঞানের বিশাল ব্যাপ্তি—সর্বোপরি জলদ্‌গম্ভীর সেই অনন্য কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে তিনি যেন এক বিরাট প্রাণপুরুষ যিনি কলেজের সব ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে একে অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারা কখনো তাঁর কর্মধারাকে আচ্ছন্ন করেনি

—প্রিন্সিপাল রূপে তিনি ছিলেন সমদর্শী, সুপরিচালক, স্বচ্ছ প্রশাসক এবং নিষ্ঠার গুণগ্রাহী। আমার কর্মজীবনে কয়েকবছর মাত্র তাঁকে পেয়েছিলাম—কিন্তু আজও তাঁর সিংহাসনে আমার মনের মধ্যে তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজমান। আমার সৌভাগ্য যে ঐ গগনস্পর্শী উচ্চতার কাছে পৌঁছাতে পেরেছিলাম। ক্লাস চলাকালীন নিঃশব্দে তিনি বাইরে ঘুরে যাচ্ছেন এটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু কখনো তিনি ক্লাসের ভেতরে ঢুকে শিক্ষককে বিব্রত করতেন না। একদিন তাঁর ঘরে আমার ডাক পড়ল। নিজের কাজের ওপর আমার আস্থা ছিল, কিন্তু তবু কেন ডেকেছেন বুঝতে না পারায় অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি মুখ নিচু করে ফাইল দেখছেন। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে বললেন। তারপর যখন কথা শুরু করলেন, নিজের মুখভঙ্গি সম্বন্ধে আমি নিজেই নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকাতেই ভয় করছিল। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের প্রতিটি কথা আমার মনে আছে, ঐ কথাগুলিকে নেড়েচেড়ে আজও সুখ পাই। তিনি বললেন, 'তুমি মার্কসের রিলিজিয়ন তত্ত্ব পড়াচ্ছিলে। আমার ভালোই লাগছিল। কিন্তু এই তত্ত্বের সমালোচনায় তুমি রাধাকৃষ্ণণের উল্লেখ করেছিলে। রাধাকৃষ্ণণ ভাবের জগতের লোক, মার্কসের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের প্রতি কি সুবিচার করতে পারেন? তোমার কি মনে হয়?' আমি একটু হতভম্ব হয়েছিলাম কিন্তু বাক্যহারা হইনি। মুহূর্তে আমার মনে হলো আমি রাজনীতিবিমুখ হলেও সামনের ভদ্রলোকটি কিন্তু তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোকেই সব কিছুর বিচার করেন। মৃদু গলায় বললাম, 'স্যার, বস্তুবাদীকে ভাববাদী আক্রমণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। আমি রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য উল্লেখ করেছি, ওটা মন্তব্যই। আমি ঐ মতের সহযোগী না-ও হতে পারি। তবে মার্কসের সমালোচনায় রাধাকৃষ্ণণের মতো সুপণ্ডিতের মন্তব্য বোধহয় মার্কসের মতবাদের গুরুত্বই বাড়াবে।'

তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমার কাছে মার্কসের ওপর লেখা কিছু বই আছে। অবশ্য সেগুলি তুমি পড়েও থাকতে পার। বইগুলি যদি দেখতে চাও আমার বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।' আমি সানন্দে সম্মতি জানিয়ে তাঁর ঘরের বাইরে এসে উত্তেজিত আনন্দে স্টাফরুমে ফিরে এলাম। আমার জীবনে অনেক দুঃখের ঘটনা ঘটেছে। স্মৃতি সততই সুখের নয়। কিন্তু অমিয়বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের এই স্মৃতিটুকুকে আমি আজও সযত্নে লালন করে চলেছি। অবসর নেওয়ার দীর্ঘ কয়েকবছর বাদে অমিয়বাবুর মৃত্যু হয়। কলেজের সংলগ্ন তাঁর বাড়িটিতে গিয়ে তাঁকে শেষ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। যে কোনো কারণেই হোক তাঁর মৃত্যু নিয়ে হৈ-চৈ বোধহয় অনেকের কাম্য ছিল না। রাজনীতি করার এই এক অসুবিধা। যে পথে তুমি একবার হেঁটেছ—উল্টোপথে বা ঘুরপথে হাঁটার সুযোগ থাকলেও সংশয়ের চোখে দেখা হয়। বরং অ-রাজনৈতিক ব্যক্তির অনেক সুবিধা, অনেক স্বাধীনতা। বিপ্লব—প্রতিবিপ্লব, অনুবিপ্লব, মহাবিপ্লব সব রকম সৃষ্টিছাড়া পথ পরিত্যাগ করে সে কেমন সুখী ও নিরাপদ! আমরা বোধহয় অধিকাংশই নিরাপত্তাকে বড়োই পছন্দ করি। তাই সবরকম বঞ্চনা, দুর্নীতি, অনিয়ম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরা কফি হাউস, অফিস, ক্লাব সরগরম করে আবার যে যার পরিচিত বৃত্তে ফিরে আসি, এইসব কাগুজে বাঘদের আবার একধরনের Pragmatic প্রয়োজনীয়তা থাকে। সবাই ঝাণ্ডা ধরলে ঝাণ্ডাধারীদের ঘর সামলায় কে? তাছাড়া 'তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।' কতসব দেশহিতৈষী সর্বত্যাগী মহা মহা দেশনায়কেরা দেশের ভালোমন্দ চিন্তা করছেন সর্বসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে! কম কথা! তাঁরা কাকে তুলবেন কাকে নির্বাসনে দেবেন তাঁরাই নির্ধারণ করবেন। তাঁরা স্ব-সৃষ্ট অ-সাধারণতায় যা করেন তা ভালো কি মন্দ তাঁদেরই অ-সাধারণ উত্তরসূরীরা তার বিচার করেন। আমরা সাধারণ মানুষ। যাকে

ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি তাঁর একটা Larger than life মনশ্চিত্র গড়ে তুলি, তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে শুধু চলচ্চিত্রের একটি সাধারণ সমাপ্তি নয়, একটি বিয়োগ, একটি ব্যথা, একটি চলে যাওয়া। আমরা যারা রয়ে গেলাম তাঁর শেষ যাত্রায় কোনোভাবে কেন তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারলাম না তার রহস্যভেদ করার কোনো উৎসাহ আমার নেই। কারণ আমি জানি ঐ অসাধারণ সাহসী পুরুষটির চিন্তাধারায় পরিবর্তন এলেও কোনো স্খলন হতে পারে না। তিনি অত্যন্ত ভালোবাসায়, অত্যন্ত আন্তরিকতায়, অত্যন্ত শ্রদ্ধায় যে মতাদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই আদর্শের পরিধি হয়তো বিস্তৃত হয়েছিল, কিন্তু তার চেহারা বদলায়নি। এটা আমার স্বজ্ঞালব্ধ অনুভূতি। আমার কর্মজীবনের কথা বলতে গেলে তাঁর সম্বন্ধে আমার চিন্তাভাবনা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে।

আমার শিক্ষক-সহকর্মীদের মধ্যে বেশিরভাগই বেশ প্রবীণ। তাঁরা সবাই মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু মেল শভিনিজম (Male Chauvinism) তাঁদের মধ্যে অল্পবিস্তর ছিল। বয়সে তরুণী 'মেয়েরা' আবার জানে কি—এই ধরনের একটা মনোভাব ছিল। আমাদের সুখ্যাতিতে তাঁরা খুব যে একটা খুশি হতেন না বোঝা যেত। প্রিন্সিপ্যালকে ঘিরে তাঁরাই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। আবার শ্রদ্ধায় যথেষ্ট আনত হলে তাঁরা মোলায়েম হতেন। আমরা সংসারী মেয়েরা রুটিনের ব্যাপারে তাঁদের দাক্ষিণ্যের প্রয়াসী ছিলাম। আমি সুযোগসন্ধানী নই, কিন্তু প্রবীণ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করলে আমার মর্যাদার হানি হবে না মনে করতাম। তাঁরা আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন না, আমার প্রতি যথেষ্ট সদয় আচরণ করতেন। আমিও মনে করতাম বয়স্কদের একটু গাম্ভীর্য প্রদর্শন আমাদের ছেলেমানুষী চাপল্যকে দমন করে রাখে। কারণ আমরা সহকর্মী হলেও আমাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। অভিজ্ঞতা মানুষকে

সমৃদ্ধ করে নানাভাবে। এই প্রজ্ঞালব্ধ ঋদ্ধিকে সম্মান জানানোই উচিত। তাঁদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় না নেমে বরং তাঁদের মনোভাবে যাতে নবীনদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থাকে সেটাই কাম্য, প্রবীণ-নবীনের কোনো তুলনামূলক আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। আজ প্রবীণ বয়সে প্রবীণতর আমার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা আনন্দিত হন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রাপ্তিই বা কম কি! মানুষে মানুষে বয়স, শিক্ষা, অন্যান্য যোগ্যতার ব্যবধানকে অতিক্রম করে যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেখানে আমরা সবাই একসূত্রে বাঁধা। দুঃখ হতো যখন দেখতাম অবসৃত মানুষগুলি আর্থিক প্রয়োজনে কলেজে আসতেন তখন অধিকাংশ কলেজ কর্মী তাঁদের সম্বন্ধে নিরুৎসাহ মনোভাব দেখাতেন। এটা হয়তো ইচ্ছাকৃত নয়। পটভূমি কখনোই চেতনার কেন্দ্রে আসতে পারে না। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা কেউ প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করতে পারি না। নিজের কথা লিখতে গিয়ে আমি একটি ভালো মেয়ের উপাখ্যান লিখতে বসিনি। আমার নিজের ত্রুটিগুলি যদি অন্যের দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম! আমিও কি অবসৃত প্রবীণদের প্রতি পূর্বের আগ্রহ অনুভব করেছি? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যাঁরা আশেপাশে আছেন তাঁরাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। মস্তিষ্ক যাতে স্মৃতি ভারাক্রান্ত না হয় সেইজন্যই বোধহয় বিস্মৃতির একটি স্বাস্থ্যকর নিদান প্রকৃতিতে আছে। কিন্তু সব ভুলে থাকাই কি ভুলে যাওয়া? স্মৃতির ছবি মিলালেও ব্যথার তাপ থেকে যায়।

সহকর্মিণীদের মধ্যে আমি মহাশ্বেতা দেবীকে পেয়েছিলাম। তিনি আমার প্রতিবেশী ছিলেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে পাড়ায় দেখা হওয়া ছাড়াও কলেজে মাঝে মাঝে তাঁর যাত্রাসঙ্গী হতাম। তখন তিনি আজকের মতো জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেননি, যদিও সুলেখিকা

হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করছিলেন। তিনি আমাদের কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা ছিলেন এবং ঐ কলেজেই অধ্যাপনা থেকে অবসর নেন। তিনি বয়সে আমার থেকে বেশ বড়োই ছিলেন, চলনে-বলনে দাপুটে এই মহিলাটি কিন্তু অতি সহজে সকলকেই আপন করে নিতেন। আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না।

স্থানগত নৈকট্য থাকায় আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে জানতে পেরেছিলাম। তিনি ষোলোআনা মানবিক ছিলেন, কোথাও জ্যোতিষ্কের সুদূরতা ছিল না। মূর্তিমতী প্রজ্ঞারূপে গুরুগম্ভীর কথাবার্তাতে চমৎকৃত করার কোনো প্রয়াস তাঁর ছিল না। 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বা নারীসুলভ কমনীয়তার অতি স্পর্শকাতরতা তাঁর না থাকলেও তিনি স্কুলের বড়োদিদিমণিসুলভ অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতেও প্রকটিত হতেন না। আসলে তাঁর আচরণে এমন একটা সহজভাব ছিল যে নর-নারীর ভেদরেখাটি মুছে গিয়ে একজন মানুষ রূপেই তাঁকে আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার আচরণ বোধহয় তাঁর প্রভাবেই ধীরে ধীরে জড়তামুক্ত হয়। তাছাড়া কালের ব্যবধানে আমার মধ্যেও আচরণগত পরিবর্তন আসে। আমি আরও সবাক, আরও উন্মুক্ত, আরও স্বচ্ছন্দ হলেও কলেজের প্রশাসনিক ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিলাম। মহাশ্বেতা দেবীর উৎসাহে এবং আমার সহকর্মীদের ঐকান্তিক আগ্রহে আমাকে শিক্ষক সংসদের সম্পাদক হতে হয়। 'হতে হয়', কারণ এই গুরুভার বহনের উপযুক্ততার ব্যাপারে আমি শঙ্কিত ছিলাম, যদিও 'আমরা তো আছি, ব্যাপারটা কিছুই নয়' এই ধরনের কথাবার্তায় আমার শুভার্থীরা আমার আশঙ্কা দূর করার ঐকান্তিক প্রয়াস করেছিলেন। বোধহয় আমি সর্বজনগ্রাহ্য ছিলাম বলেই তাঁরা আমার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতা ছাড়া অন্য ব্যাপারে আমার আগ্রহের অভাবে আমার কাছে এই অধ্যায়টি মনে রাখার মতো উজ্জ্বল নয়। বরং আমার আনাড়িপনা ও উপদেশের

জন্য পরনির্ভরতা আমাকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল। সকলকে সন্তুষ্ট করতে গেলে কাউকেই যে বিশেষভাবে খুশি করা যায় না—এটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম। এর পরে কোনো প্রশাসনিক পদে যাওয়ার অনুরোধ আমি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এমনকি দর্শনবিভাগে প্রধান অধ্যাপিকা পদটিও আমার কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না, কিন্তু অনিবার্যতার জন্যই আমাকে এই পদ গ্রহণ করতে হয়েছিল। অবশ্য বিভাগটি ক্ষীণ কলেবর হওয়ায় সহকর্মীদের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা হয়নি। সমস্যা হওয়ার মতো জটিলতা না থাকায় আমি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে আমার দায়বদ্ধতা থেকে কখনোই বিচ্যুত হইনি। এই উপলব্ধিতে আমি শান্তি পাই, অন্তত এই ব্যাপারে আমি কাউকে প্রতারিত করিনি, নিজেকে তো নয়ই।

আমার কর্মজীবনে সত্তরের দশক প্রথম পর্ব, আশির দশকে মধ্যাবস্থা, নব্বইয়ের দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম তিনটি বছর অন্তিম পর্ব। কিন্তু এই তিনটি অধ্যায় এত পরস্পর সংশ্লিষ্ট যে এদের আলাদা প্রকোষ্ঠে ভাগ করা যায় না। বৌদ্ধ দর্শনের দীপশিখার ধারাবাহিকতার উপমাটির সঙ্গে প্রতিটি জীবনের সাযুজ্য রয়েছে। সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আজও আমার কাছে বর্তমানের সজীবতা ও স্পষ্টতায় স্মৃতিপটে ধরা রয়েছে। ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের কলেজে পড়াশোনার ব্যাপারে বিশেষ কোনো বাধা আসেনি। যদিও কলেজ ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তার বেষ্টনী ও সতর্ক প্রহরা, চারিদিকে বোমা-গুলির শব্দ। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা-কেন্দ্র হওয়ায় নিয়মের তোয়াক্কা না করা পরীক্ষার্থীদের সদম্ভ অরাজকতা সবই প্রত্যক্ষ করেছি। কোনো কোনো সময়ে যাতায়াতের রাস্তায় হঠাৎ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছি। গোলমাল থামলে কিন্তু বাড়ি ফিরে আসিনি, কলেজেই গিয়েছি। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিও ছিল প্রায় স্বাভাবিক। আমি আদৌ অসমসাহসিকা নই। বরং বেশ ভীতুই বলা যায়। কিন্তু

আমার কলেজের অবস্থান একটি উদ্বাস্তু প্রধান অঞ্চলে, যার মধ্যে একটি ঘরোয়া আবহ ছিল, ছিল ব্যক্তিনির্বিশেষে বরাভয়ের আশ্বাস। আমি জানতাম আমার কোনো ক্ষতি হবে না। এমন অনেকদিন গেছে যখন স্থানীয় কোনো বিপ্লবী ছাত্রই আমাকে নিরাপদে প্রস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেই নিয়মভাঙার দিনগুলিতে আমরা কিন্তু অপ্রত্যাশিত শৃঙ্খলায় কাজ করেছি। হয়তো আমাদের ছোটো কলেজকে বাঁচানোর মরিয়া প্রয়াস ছিল, কিন্তু কি অসাধারণ দৃঢ়তায় বাস্তুহারা মানুষগুলি সবরকম প্রতিকূলতাকে জয় করার সাহস জুগিয়েছেন ভাবলে আজও শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। এই মানুষগুলির মধ্যে আমাদের কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ভাবলেও গর্বিত হই।

আমার কর্মজীবনে আমার শিক্ষাকর্মী বন্ধুদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এঁদের সংখ্যা কলেজের সমৃদ্ধির সঙ্গে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় গুটিকয়েকের সঙ্গে আমার যে আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল—আজ বহুজনের কাছেও আমি সমান আদৃত। অমলবাবু, উমাদাসবাবু, রঞ্জিতবাবু এঁরা আমার প্রথমদিকের সঙ্গী। অমলবাবু পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় দাপটের সঙ্গে অফিস চালাতেন, উমাদাসবাবু নম্র স্বভাবের হিসাবরক্ষক, রঞ্জিতবাবু ঘাড় গুঁজে টাইপ করে যেতেন। এঁরা সবাই আমাকে পরিণত করার ব্যাপারে মূল্যবান উপদেশ দিতেন, কলেজের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন। সদাহাস্যময় লাইব্রেরিয়ান শঙ্করবাবু দৌড়াদৌড়ি পছন্দ করতেন না, চেয়ার-সংশ্লিষ্ট থাকতেই পছন্দ করতেন, কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা করেছেন এমনটি দেখিনি। তাঁর শৌখিন সুবিন্যস্ত পোশাক (ধুতি-পাঞ্জাবি) বোধহয় তাঁর সচলতার পক্ষে বাধা হয়েছিল। কিন্তু এঁরা প্রত্যেকেই অনন্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শ্রেণীবিন্যাসে শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে যাঁরা অধস্তন ছিলেন, তাঁরাও কিন্তু তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতায়

আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। আমাদের স্টাফরুমের দেখভালের ভার যাঁর উপর ছিল, সেই প্রফুল্লবাবু একবেলা খেতেন। বাড়িতে তাঁর অনেকগুলি পুষ্যি ছিল। কিন্তু এর জন্য তাঁর নিয়মানুবর্তিতায় কোনো শৈথিল্য আসেনি। একনিষ্ঠ কর্মীর তিনি এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আর কলেজের প্রতিষ্ঠার সমকালীনতার গৌরবে গর্বিত অনন্য লক্ষ্মীবাবু! তাঁর ভাষা ভালো করে বুঝতে পারতাম না, কিন্তু তিনি সবসময়ই কোনো না কোনো ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন বোঝা যেত এবং একমাত্র তিনি সবদিকে দৃষ্টি দিলেই কলেজ ভালোভাবে চলে এমনই ইঙ্গিত দিতেন। এই ইঙ্গিতের মধ্যে নিজেকে জাহির করার প্রচেষ্টা ছিল না, ছিল কলেজের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ। এঁরা সবাই অবসৃত, কিন্তু কলেজের বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের স্থান উপেক্ষণীয় নয়। আজকের প্রজন্মের শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে অনেকে আমাদের ছাত্রও আছেন, শিক্ষাকর্মীদের সন্তানও আছেন, সবসময়েই আশা করি তাঁরা কলেজের প্রতি নিষ্ঠায়, ভালোবাসায় তাঁদের পূর্ববর্তীদের মতোই আন্তরিক হবেন। এমন অনেকদিন গেছে আমরা মাস শেষে মাইনে পর্যন্ত পাইনি। এতে আমরা যথেষ্ট বিব্রত ছিলাম, কিন্তু সকলেই কষ্ট করছি এই অনুভূতি আমাদের কর্মধারায় অচলতা আনেনি। আমার শিক্ষক-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ যদি বয়স্ক শিক্ষাকর্মীদের নাম ধরে সম্বোধন করেন, আমি দুঃখ পাই। শ্রেণীবৈষম্য সম্বন্ধে সজাগ হলেই কি কৌলিন্য অর্জন করা যায়! যে শিক্ষার সঙ্গে মানবিকতার সম্পর্ক নেই, তাকে নিছক ডিগ্রি বলা যায়, সংস্কৃতি বলা যায় কি? সংস্কৃতির নির্ধারক আমি নই, কিন্তু যে আবহে আমার প্রতিপালন ও পরিপুষ্টি—তার থেকে বিচ্যুত হওয়ার উপায় আমার নেই। এই অসহায়তায় আমার কোনো লজ্জা নেই, বরং অন্যরকম চিন্তাভাবনায় আকৃষ্ট হওয়ার মতো অনুপ্রেরণার অভাব বোধ করি।

সত্তরের দশকের শেষার্ধে এবং আশির দশকের প্রথম দিকে কলেজে অনেক নতুন মুখ দেখা গেল। এর মধ্যে আমাদের কলেজ তার ভাঙাচোরা দুঃখী চেহারা পরিত্যাগ করে বেশ দর্শনীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐ দিনটি আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। কে মুখ্যমন্ত্রীর কত কাছে যেতে পারেন তার যেন একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রীর গলায় কম্পিত হাতে মালা পরালাম, তাঁর সদাগম্ভীর মুখেও ওষ্ঠরেখাটির ঈষৎ প্রসারণ ঘটল। তাতেই আমি শিহরিত! যাই হোক, নতুন ভবনে নতুন আগন্তুকেরা এলেন—কেউ শিক্ষকরূপে, কেউ শিক্ষাকর্মী রূপে, আবার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শৈলেনবাবুর ভার লাঘব করার জন্য একজন নতুন প্রিন্সিপাল। প্রাণিবিদ্যা বিভাগের রীতা সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যায় দিলীপ মজুমদার, ইংরেজিতে অভিজিৎ সেন, আমার নিজের বিভাগে সুশান্ত চক্রবর্তী এবং প্রিন্সিপালরূপে আশুতোষ কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায়। রীতাকে আমি আজও আমার একান্ত আপন-জনের মতো পাই, অভিজিৎ এখন বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগ অলঙ্কৃত করছে, সুরসিক দিলীপ পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান, সুশান্ত আমার বিভাগের হাল ধরেছে। শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে অরিজিৎ (বঙ্কু) ও বিহারেশ সমকালীন নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অরিজিতের আজও আমি অতি প্রিয় 'দিদি'। অমন রন্ধনপটু, উদ্যানবিশেষজ্ঞ আবার জুলজিবিভাগের রীতাদির ভার সামলানোর সব কাজ সে অতি নিপুণভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে করছে। বিহারেশ কেমিস্ট্রি বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। সুবক্তা ও শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সজাগ এই তরুণটিও আজ মধ্যবয়স্ক। এরা সবাই যেন নতুন চেহারার কলেজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংযোজন ছিল। ওদের সঙ্গে নিযুক্ত রীতার বিভাগে সীমা, মৌসুমী আজও ভার সামলাচ্ছে। ওরা সবাই সপরিবারে ভালো থাকুক।

ভালো থাকুন তৎকালীন প্রিন্সিপাল শ্রী তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি আমার বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। একই পথে আসা-যাওয়ায় আমাদের মধ্যে কলেজের বৃত্তের বাইরে একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ভদ্রলোক কেমিস্ট্রির শিক্ষক হয়েও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এমন সুন্দর করে বিভূতিভূষণ বা টেনিসন বা জীবনানন্দ উদ্ধৃত করতেন যা আমি খুবই উপভোগ করতাম। কারণ অন্য প্রিন্সিপালরা বয়স্ক এবং কলেজের বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায় আমি তাঁদের অন্য পরিচয় পাইনি। কিন্তু কলেজ তখন ক্রমবর্ধমান, প্রশাসনে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে চালানোর মতো দক্ষ প্রশাসক তিনি ছিলেন না। তাছাড়া তাঁর সাংসারিক জীবনেও একমাত্র পুত্রের দুর্ঘটনাজনিত ব্যয়বহুল চিকিৎসায় তিনি বিব্রত ছিলেন। আমার কেমন মায়া হতো, এত সুশিক্ষিত এবং সুভদ্র একজন ব্যক্তি শিক্ষক-জীবনেই আরও এগিয়ে যেতে পারতেন, কেন প্রিন্সিপাল পদের মোহে তিনি এই সমস্যাসঙ্কুল জটিল আবর্তে আত্ম-বলিদান দিলেন ভাবলেও আমি দুঃখিত হতাম। কিছুদিন বাদেই তিনি শিক্ষক-জীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পথই অনুসরণ করেছিলেন। মাঝখানের এই চার বছর তিনি অনর্থক তাঁর সম্ভাবনাকে নষ্ট করলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা কলেজের অনেকেই ভালো চোখে দেখতেন না। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমি অনেকদিন যাবত কাজ করায় এবং তাঁদের প্রীতিভাজন হওয়ায় আমার কোনো বিচ্যুতি ঘটতে পারে এটা তাঁরা ভাবতেন না। এই 'বাইরের লোকটি'ই তাদের প্রিয় 'ম্যাডাম'কে কলঙ্কিত করছেন এইরকম একদেশদর্শিতা তাঁদের ছিল। আমি এতটা স্বার্থপর নই যে তাঁদের মূল্যায়নে নিজেকে নিরাপদ মনে করে জীর্ণ বস্ত্রের মতো এই সম্পর্কের ইতি ঘটাব। আমি আমার গুণমুগ্ধতাকে, আমার মমত্ববোধকে আবৃত রাখিনি, কিন্তু তাঁর কল্যাণের জন্যই আমি ধীরে ধীরে নিজেকে

দূরে সরিয়ে নিলাম। তিনি অন্য একটি কলেজে যখন চলে গেলেন— আমি দুঃখিত হইনি, কিন্তু শূন্যতা অনুভব করেছিলাম। মানুষ কেন যে বহুমাত্রিক সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর, পরিণত বয়স্ক নরনারীকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো নৈতিক অনুশাসনে আবদ্ধ রাখবে, কেন তাদের নিজস্ব শালীনতা ও রুচিবোধের উপর আস্থা রাখবে না, এটা আমাকে আজও পীড়িত করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের কোনো মুক্তি নেই। বিশেষত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষজনের, আমরা বোধহয় সর্বত্রই স্থিতাবস্থার পক্ষপাতী। তাছাড়া আমাদের সংসার আমাদের সবটুকুই গ্রাস করে ফেলে, জনক-জননীর পুত্র-কন্যাতেই সংশ্লিষ্ট থাকা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তাভাবনা আজও অননুমোদিত। আজকের 'চলতি হাওয়ার পন্থী'দের আমি ঈর্ষা করি না, কিন্তু সন্তানরূপে তারা পিতামাতাকে যেন রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে দেখে, পৌরাণিক চরিত্রের অনুলিপিরূপে নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি মানবিকতাকে আজও সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে থাকি। যে ক'দিন বাঁচব আমার ethos আমার স্বনিয়ন্ত্রণেই থাকবে।

কয়েক বছরের ব্যবধানে আবার একদল নতুন মুখ কলেজে দেখা গেল। গণিতে অসম্ভব উজ্জ্বল সরস সপ্রতিভ শ্রীবিশ্বজিৎ সেন এদের কিছু পূর্ববর্তী। এই ছেলেটিকে আমি খুবই পছন্দ করি। সে এখন আমার বাড়ির কাছেই থাকে। বর্তমানে কী অদ্ভুত দক্ষতায় সে এতগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রুটিনে প্রতিযোজিত করে তাতে তার তারিফ না করে পারা যায় না। কিন্তু শুধু রুটিনের খসড়া তৈরির মধ্যে তার মেধার উৎকর্ষকে সীমিত রাখলে শিক্ষকরূপে তার সাফল্যের অমর্যাদা করা হবে। গণিত বিভাগে সে শৈলেনবাবুর যোগ্য উত্তরসূরী। মাঝে মাঝে টেলিফোনে সে তার দিদির খোঁজ নেয়। সারমেয়-বৎসল এই যুবকটি আজ কিছুটা প্রবীণ, কিন্তু আজও

তার মেধা-উজ্জ্বল সরস কথাবার্তা আলাপচারিতায় অন্য মাত্রা আনে। অবসৃত জীবনে তার অভাব অনুভব করি। তার পরবর্তীকালে আমাদের কলেজে এসেছেন রাষ্ট্র বিজ্ঞানে মধ্যবয়স্ক প্রাবৃট ·দাস মহাপাত্র। ইনি একজন sparkling conversationalist, দক্ষ বিশ্লেষক এবং ঈর্ষণীয় কণ্ঠস্বরের অধিকারী। ঐ বিভাগে আমার কিছু আগে অবসৃতা প্রণতিদি ওঁকে পেয়ে বিভাগটিতে ঔজ্জ্বল্য আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ প্রণতিদি মৃদুভাষিণীই শুধু নন, অত্যন্ত শান্ত ও নম্র প্রকৃতির। লাবণ্যের সঙ্গে বাক্ প্রতিভার মেলবন্ধন হওয়া নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের কাছে কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তি। বাংলা বিভাগে প্রবীণ দিলীপবাবু কিছুসময় কলেজকে আলোকিত করেই অকালে প্রয়াত হন। তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করেন আমার অতি প্রিয় শ্রীমতী কথাকলি সেনগুপ্ত। প্রণতিদির সঙ্গে এই মৃদুভাষিণীর মিল থাকলেও এঁর কণ্ঠস্বর এখনও সচেষ্ট না হলেও শোনা যায়। বুদ্ধিমতী এই মহিলাটি অসম্ভব বই পড়তে ভালোবাসেন, রুচিশীলা এবং স্বচ্ছন্দ আলাপচারী। এঁর পরবর্তিণী অনুরাধা তার নামের মতোই সাবেকি ও সুন্দরী। বয়সে ছোটো এই মেয়েটি কিন্তু স্পষ্টবক্তা ও সুগম্ভীর। তার ব্যক্তিত্বের দ্যুতিময়তায় মাঝে মাঝে বড়োই স্তিমিত হয়ে যাই। বয়স হলেও আমার মধ্যে ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট প্রকাশ ঘটেনি। তা না হোক—অনুরাধারা আছে বলেই মহিলাকুলে ভারসাম্য বজায় আছে। মহিলাকুলের প্রসঙ্গে শিক্ষাবিভাগে শ্রীমতী গার্গী দত্ত কথাকলির পূর্ববর্তী এক উজ্জ্বল সংযোজন। অনুপম দেহ-সৌন্দর্য। বিভিন্ন নান্দনিক কলায় পারদর্শী, সপ্রতিভ এই মহিলাটি প্রচার-মাধ্যম, সেমিনার, বই লেখা নানাবিধ কর্মযজ্ঞ কি অনায়াস দক্ষতায় যে সামলাচ্ছে বিস্মিত হতে হয়। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁদের ঔজ্জ্বল্যের হানি হয় না।

বিশ্বজিতের পরবর্তীকালে আরও কয়েকজন শিক্ষককে আমি

বিশেষ তালিকায় রাখব। ইংরেজি বিভাগে বর্তমানে প্রধান অধ্যাপক চিন্ময় গুহ ও রণবীর লাহিড়ী, অর্থনীতিতে অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং পদার্থবিদ্যায় দেবাশীষ চ্যাটার্জি যে-কোনো কলেজের পক্ষে মূল্যবান প্রাপ্তি। বহুভাষাবিদ্ চিন্ময় যখন প্রথম যোগদান করে আমি তাকে ছাত্র বলে ভুল করেছিলাম। বয়সে তরুণ এই ছেলেটি তার শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত বাক্-বৈদগ্ধ্যে, অতলান্তিক জ্ঞানের গভীরতায়, সর্বোপরি শব্দচাবুকের যাদু ব্যবহারে আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতা ক্রমবর্ধমান ও আজ প্রায় ভ্রাতৃস্নেহে আমার হৃদয়কে প্লাবিত করে। সে আমার অকৃত্রিম শুভার্থী ও অনুরাগী, অথচ প্রথমদিকে তাকে বড়োই সুদূর, alienated মনে হয়েছিল। আমার বিদায় দিনে সে শিশুর মতো কেঁদেছিল। তাকে দিয়েই বুঝেছি আমাদের ভারতীয় দর্শনে কেন জ্ঞানকে 'অনুভব' বলা হয়। তার আপাত-কঠিন চেহারায় আবৃত এক শিশুর মতো আবেগমথিত স্নেহের আতুরতার কথা ভাবলে আজও আমি অভিভূত হই। বিশ্বের সারস্বত মহলে সে আদৃত ও প্রশংসিত, আমি কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে কোথাও প্রকাশিত হইনি, অথচ আমার প্রতি তার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমাকে বিস্মিত ও লজ্জিত করে। সম্প্রতি তার ভগ্নস্বাস্থ্যে আমি খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করি। যতদিন সে কলেজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকবে কলেজেরই মঙ্গল। তার বিভাগে শ্রীরণবীর লাহিড়ী স্বল্পবাক্ কিন্তু প্রজ্ঞা ও মেধায় উজ্জ্বল, আমি তার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ ও আবেগ অনুভব করি, যেমন করি অর্থনীতির অপ্রিয় সত্যভাষী অভিজিতের প্রতি এবং কলেজের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ দেবাশীষ চ্যাটার্জির প্রতি। এদের সঙ্গে কাজ করা এক বর্ণময় অভিজ্ঞতা।

এবার আমি আমাদের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রী পুষ্পিতারঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আমার অনন্য অভিজ্ঞতার কথা বলব। তাপসবাবুর পরবর্তী প্রিন্সিপাল নিতাইবাবু অত্যন্ত অনাড়ম্বর অপ্রকটিতভাবে তাঁর কর্তব্য

নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে বিদায় নিলে প্রায় এক বছরের জন্য প্রণতিদি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর কার্যকালের অবসানে কলেজে নতুন প্রিন্সিপালরূপে এলেন শ্রী পুষ্পিতারঞ্জন ভট্টাচার্য।এক বর্ণময় চরিত্র। নিজের নামটির মতোই অভিনব ও আকর্ষক। বয়স তারুণ্যের সীমা অতিক্রম করেনি। অত্যন্ত সপ্রতিভ, তীক্ষ্ণধী ও উদ্যমী। এঁর পোশাকচিন্তার সঙ্গে নিজের খুবই সাযুজ্য পাই। আমি আমার শাড়ির ব্যাপারে নিয়ত পরিবর্তনশীলতায় আগ্রহী। আমাদের নতুন প্রিন্সিপালটিও কোনোদিন সাহেব তো কোনোদিন সাবেকী বাঙালিবাবু। প্রিন্সিপাল বলে তিনি পোশাকবিলাসী হবেন না এমন কোনো স্থবির বিশ্বাসে আমি আগ্রহী নই। বরং তাঁর সুসজ্জিত ঘরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাঁর পোশাক-সমৃদ্ধ উপস্থিতি আমার ভালোই লাগত। ক্রমশ পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আমি একজন অত্যন্ত মানবিক, পরহিতৈষী, আবেগপ্রবণ ব্যক্তিরূপে আবিষ্কার করি। প্রিন্সিপাল-ভজনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তাঁর মাতৃ সম্বোধন হৃদয়দৌর্বল্যঘটিত কারণে আমাকে তাঁর প্রতি সস্নেহ আবেগে হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট করেছে। এই পক্ষপাত কিন্তু নিছক একদেশদর্শিতা নয়। তাঁর কার্যকালে ইতিমধ্যেই তিনি 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতা'য় উত্তরণ ঘটিয়েছেন আমাদের কলেজের। প্রায় সব বিভাগে অনার্স এসেছে। মাইক্রো-বায়োলজির মতো অত্যাধুনিক বিষয়ও তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বহু স্লেট-নেটের বেড়া টপকানো ঝকঝকে মেধা-উজ্জ্বল শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন, কলেজ আরও সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে, বিদগ্ধজন-আলোকিত সেমিনার ও আলোচনা সভা প্রথাগত শিক্ষাকে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে নতুন পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সুস্পষ্ট, খেলাধুলাতেও আমাদের কলেজ অনেক আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। এর মূলে আছে নরেন্দ্রপুরের কৃতী ছাত্র ও শিক্ষক

আমাদের প্রিন্সিপালের অদম্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। কলেজ ঘিরে তাঁর স্বপ্ন সফল হোক। আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক মঙ্গলকামনায় তাঁর জীবনে আসুক 'শিশিরে ধোওয়া শান্তি'। প্রশাসকের কর্তব্য অনেক অপ্রিয়সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। বিশেষ করে শিক্ষকদের কলেজের উপস্থিতিকে পাঁচঘন্টায় আবদ্ধ করা যে প্রাণহীন দায়বদ্ধতায় তাঁদের কর্মজীবনের সজীবতাকে নষ্ট করেছে, সেটা উপলব্ধি করেও তাকে বিধিবদ্ধ করার দায়ভাগ প্রিন্সিপালকেই নিতে হয়েছে। ছাত্রছাত্রীর বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষাকর্মীদেরও বিবিধ নতুন নিয়মে শৃঙ্খলিত করার অপ্রিয় অথচ সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আবশ্যিক কাজও তাঁকে করতে হয় বা হচ্ছে। সবসময়েই প্রশাসকের বিরুদ্ধে কিছু লোকের অসন্তোষ থাকেই। কিন্তু তাঁর দায়বদ্ধতার দিকটি চিন্তা করলে প্রিন্সিপাল পদটির অনাকর্ষক দিকটি যে উপেক্ষণীয় নয় সেটাও মনে রাখা দরকার। আসলে যিনি যে পদেই থাকুন, দায়িত্বের সঙ্গে মনোরঞ্জনের সর্বদা মেলবন্ধন ঘটানো যায় না। অতএব, প্রিন্সিপালের প্রতি আমার বাৎসল্যমিশ্রিত স্নেহ অটুট থাকবে। তিনি দীর্ঘজীবি হয়ে আমাদের কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকুন এই কামনা করি।

আমি আমার কর্মজীবন সম্বন্ধে যা কিছু লিখলাম, সবই আমার অবসরের পরে। এই স্মৃতি রোমন্থনে ঘটনাক্রম সঠিক সময় অনুসারী হয়েছে কিনা জানা নেই। আমি তো ঐতিহাসিক নই। ব্যক্তি ও ঘটনা সম্বন্ধে আমার উপলব্ধিই আমার কাছে বাস্তব সত্যের মতো সজীব ও স্পষ্ট। আমার বর্তমান অনুভূতি স্মৃতিমেদুরতায় যদি সব কিছুকেই ভালোবাসার আদরে রঞ্জিত করে, যদি সব তিক্ততা ভুলিয়ে দেয়, তবে অবশ্যই ভালোবাসাই সত্য ও চিরন্তন, তিক্ততা তাৎক্ষণিক, বিস্মৃতির অতলান্ত গভীরে তার চিরবিলুপ্তি। এতে আমি অন্তত নিজের প্রতি সুবিচার করেছি। যাঁদের কথা মনে পড়ছে, যে ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁরা সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, তাঁরাই প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত বস্তুর

মতো মূল্যবান। তাঁরা আমার অতীত নন, তাঁরাই আমার বর্তমান। আমার উপলব্ধি, আমার দর্শন। আমার গার্হস্থ্যজীবনের বৃত্তের বাইরে আমার সংসার। আমাকে কর্ম থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আমার কর্মভূমিই আমার তীর্থক্ষেত্র, আমার আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়োগশালা। আমার অবসর নেওয়ার অবসর কোথায়?

যে বিচ্ছেদ শুধু মিলনের কথা মনে করিয়ে দেয়, তা তো অবভাসিক সত্যকে অতিক্রম করে এক শাশ্বত সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

দুয়োরানীর সংসার

আমার সাংসারিক জীবন শুরু হয়েছিল বেশ নাটকীয়ভাবে। আমাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত ছিল একান্ত আমাদের দু'জনের। রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়ির কাছে অসবর্ণ কায়স্থকন্যা গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত একমাত্র পুত্রের ব্যাপার হওয়ায় তাঁরা ছিলেন কঠোর ও অনমনীয়। অন্য পক্ষের সুরক্ষা না থাকায় আমাদের বাড়িতেও সাগ্রহ সম্মতি মিলল না। তাছাড়া আমার স্বামীও তখন সবে কর্মজীবন শুরু করেছেন, তাও অত্যন্ত কম বেতনে। সংসার অনভিজ্ঞ দুজন তরুণতরুণী তখন বিবাহের মধুর স্বপ্নে শুধু সাহানা রাগিণী শুনতে পাচ্ছে, প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার আনন্দে সংসারের কঠিন বাস্তব রূপটি তখন অনাস্বাদিত হওয়ায় তারা সংসারের 'স্বর্গ-খেলনা' রচনায় পরম উৎসাহী। নাই বা থাকল বধূবরণ, নাই বা পেলাম গুরুজনদের আশীর্বাদ! একেবারে পেলাম না তা নয়। আমার স্বামীর তরফে ওঁর ছোটো মাসিমা ও মেসোমশাই (সুবিখ্যাত দার্শনিক ড. জিতেন মহান্তি) আমাদের আশীর্বাদ করলেন। মাসিমা ওঁর দিদিকে মানে আমার শাশুড়িকে আমার গুণপনার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েও একটু টলাতে পারলেন না। মাসিমা নিজের অসবর্ণ এবং ভিন্ন প্রদেশিয় বিয়েতেও আমার শাশুড়ির তথা তাঁর মাতৃকুলের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কালের ব্যবধানে সেই অসহযোগিতা ক্রমক্ষীয়মাণ হলেও আমাদের বিয়েতে এটা নতুন মাত্রা পেল।

মাসিমা ও মেসোমশাই নিজেদেরই অপরাধী ভাবছিলেন, এতে কেমন যেন অসহায় ও লজ্জিত বোধ করেছিলাম। তবে আমার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব। মেসোমশাই শুধু আমার শিক্ষাগুরু নন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধুনা জীবিত দার্শনিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এখন আমেরিকা প্রবাসী হলেও প্রতি বছর তিনি ভারতে এলে আমাদের খোঁজখবর নেন। তাঁর বর্তমান ভঙ্গুর স্বাস্থ্য কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চাকে ব্যাহত করতে পারেনি। এই বিরাট ঋদ্ধি ও সিদ্ধি আমার নেই, কিন্তু ওঁর জ্ঞানস্পৃহাকে আমার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছি এটাও একটা বড়ো প্রাপ্তি। যদিও আমেরিকার মতো পড়াশোনার উন্নত আবহ এখানে নেই, আমার শারীরিক ক্ষমতাও প্রায় নিঃশেষিত হতে চলেছে। কিন্তু এই দৈন্যে আমার মাথা নত হয়নি, আমি আমার মতো করে আমার অভাবের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু অন্তত জমা করতে পেরেছি—এতে একধরনের আত্মতৃপ্তি অনুভব করি। আবার ফিরে যাই আমার গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম পাঠশালায়!

যাদবপুরের ছোটো একটি ফ্ল্যাটে আমাদের সংসার-জীবন শুরু হলো অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে। সংসারের সব থেকে প্রয়োজনীয় ব্যাপার খাদ্যগ্রহণ এবং তার জন্যই রান্নাঘর ও রান্না করার উপকরণ।

আমাদের নতুন সংসারে সংসার-অভিজ্ঞ কেউ নেই, মা তাই আমাদের অনেকদিনের সাথী কাজের লোক সুবোধকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের সংসারটিকে গুছিয়ে দিতে। তখন গ্যাস সুলভ ছিল না, একটি কেরোসিন স্টোভে আমাদের কাজ চালাতে হতো। সুবোধ আমাদের এইসব পার্থিব চিন্তা থেকে খানিকটা মুক্তি দিয়েছিল। সে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে অতি প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির প্রাপ্তিস্থান জেনে নিয়েছিল। কিন্তু লেক মার্কেটের বহুজনশোভিত আমার পিত্রালয়ের আকর্ষণে তাকে বেশিদিন ধরে রাখা গেল না।

সে চলে গেলে আমরা বেশ মুশকিলেই পড়েছিলাম। রান্না করা ব্যাপারটায় যে এত দুর্ভোগ কে জানত! কিন্তু এইভাবেই নানা অসুবিধা জর্জরিত হয়েও আমাদের সংসার চলতে থাকল। বৈষয়িক ব্যাপারটি আমি মোটেই দেখতে চাইতাম না। ব্যাঙ্কের পুঁজি প্রায় নিঃশেষ, বেতন সামান্য, কিন্তু আমার সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ স্বামীটি কোনোরকম ঋণ না করেই সংসারটিকে সচল রেখেছিল কোন অলৌকিক শক্তিতে জানি না। আজ প্রাচুর্য না থাকলেও স্বাচ্ছল্য অবশ্যই আছে, কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারের হিসাব-নিকাশে আমি সমান উদাসীন। অত্যন্ত কঠিন সময়ে যে মর্যাদার সঙ্গে সংসার চালিয়েছে—আজ অর্থসমাগমের মসৃণ পথে সে বাহুল্যবর্জিত কিন্তু কার্পণ্যরহিত একটি স্বস্তিদায়ক পদ্ধতিতে সংসারের হিসাবনিকাশ সবই সামলায়। কোথায় কত লগ্নী করা আছে বা আমার নিজের বেতন সম্বন্ধেও আমার ঔদাসীন্য বোধহয় এই ব্যক্তিটির উপর নির্ভরতার জন্যই, যা আমাকে বিষয়চিন্তামুক্ত রেখে অ-বৈষয়িক ব্যাপারে সংলগ্ন রেখেছে। আমার একমাত্র পুত্রের পড়াশোনা, খাওয়াদাওয়া, অসুখ-বিসুখ, শ্বশুর শাশুড়ির দেখাশোনা, কলেজের অধ্যাপনা সবকিছুই করতে পেরেছি আমার এই ভার লাঘবের জন্যই। আবার অভ্যন্তরীণ ভারমুক্ত হওয়ায় সেও তার কাজে সংলগ্ন হতে পেরেছে। আমরা আদর্শ দম্পতি কিনা জানি না, কিন্তু বোঝাপড়ার একটি প্রায়োগিক পদ্ধতি আমাদের উভয়েরই পক্ষে স্বস্তিদায়ক হয়েছে।

কিন্তু ব্যাকরণে 'দম্পতি' এই সমাসবদ্ধ পদটি জায়া ও পতির সমাহার দ্বন্দ্বের একটি উদাহরণ। দম্পতির বিকল্প পদ জায়াপতি, কিন্তু 'দম্পতি'র ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশি। শব্দটিই ইঙ্গিত দেয় সংসারে পতির প্রাধান্য, 'জায়া' পতিতে লীন হয়ে দমবদ্ধ অবস্থায় সমাহিত। সংসারের পথটি মোটেই মসৃণ নয়। ঝামেলাও অনেক। এইজন্যই বোধহয় প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে বানপ্রস্থ

অবলম্বন করতেন। তাও 'পঞ্চাশোর্ধে'। এখন পঞ্চাশ বছরেও তারুণ্য বজায় রাখা যায়। তাছাড়া বানপ্রস্থের সেই শান্তির প্রকৃতি সাম্রাজ্য কোথায়? একশো কোটির দেশে সর্বত্রই মানুষ আর মানুষ!

যাই হোক আমার গার্হস্থ্যজীবনের প্রথম অবস্থায় শাশুড়ির সাহায্য পেয়েছিলাম, তিনি আমাকে প্রায় ভারমুক্ত রেখেছিলেন, তাঁর একমাত্র নাতিটির দেখভালের কোনো ত্রুটি না হয় এইদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। আমার ছেলেটি এতই শান্ত ও মেধাবী ছিল যে তার দেখাশোনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তার অসুখ-বিসুখে খুবই বিব্রত হতাম। ওর কোনো শারীরিক কষ্ট আমার সুস্থতাকে যেন কটাক্ষ করত। ঐ কষ্ট আমিও অনুভব করতাম। যে ছেলে নিজেই সুসম্পূর্ণ, তার মায়ের কিন্তু কোথায় একটা অভাববোধ থাকে। ছেলের গঠন প্রক্রিয়ায় মানসিকভাবে মা একটি সক্রিয় ভূমিকা নিতে চান। কিন্তু কিছু হোম-টাস্কে সাহায্য করা ছাড়া আমি আর কিছু করতাম না—কারণ প্রয়োজন হতো না। যেমন সাংসারিক জীবনেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে আমার দোলায়মানতা আমাকে অপটু অকেজো করে রেখেছিল। আমি নির্বোধের মতো অনলসভাবে সাংসারিক কাজ করতাম, কিন্তু সংলগ্ন হতে পারতাম না। ত্রিবেণীতে আমার শ্বশুরের বিশাল বাড়িতে নানারকম পূজাঅচর্নার আয়োজন হতো। এই উপলক্ষে শাশুড়ি-মা দেশে গেলে আমি বেশ অসহায় বোধ করতাম। রান্না করাটা আয়ত্ত কবলেও তাতে সুগৃহিণীর পারিপাট্য ছিল না। এমনকি বাড়ির কাজের মেয়ের দাপটের কাছেও আমি আনত, যেমন দাম্পত্য কলহের আভাস পেলেই আমি আগেই আত্মসমর্পণ করতাম। 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু তব চরণধুলার পরে'। সংসারে শান্তির বিনিময়ে আমার এই নিষ্ক্রিয়তা কিন্তু আমার ব্যক্তিত্ববিকাশের পথটিকে রুদ্ধ করেছিল। আজও আমি অপরিণত, কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে হতচকিত ও দিশাহারা।

ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না। কর্মক্ষেত্রে বা সংসারে—সর্বত্রই সবাই বুঝে গেছে এই মহিলা প্রতিরোধহীন এক নিরলস কর্মী, যাঁর স্তিমিত নম্রতা দুর্বলতারই নামান্তর। কিন্তু কোনোরকম অনৈতিক কাজে আমার কখনো সম্মতি মেলেনি, কোনো বিচ্যুতি, অমনোযোগ আমি সহ্য করিনি, নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হলেও অন্যের অ-কর্তব্য আমার অনুমোদন পায়নি। কিন্তু তাতে কী! আমার প্রতিবাদ ততটা সোচ্চার হয়নি, আমার কণ্ঠস্বর ততটা উচ্চতায় পৌঁছায়নি, যাতে আমার প্রতিবাদী ভূমিকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবুও এই ঘাটতি সকলের স্নেহে শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গেছে এটা জেনেও আমি সঙ্কুচিত হয়েই থাকি—এই প্রশ্রয়ের আমি তো যোগ্য নই!

আজ কর্মহীনতার অবকাশে যখন আমার অতীত গার্হস্থ্যজীবনের কথা মনে করি কোথায় একটা ব্যথা অনুভব করি। আমার অসম্পূর্ণতা আমাকে পীড়া দেয়। আমি কোনো দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ না-ই বা হলাম, আমার সংসারটি কেন সুসংবদ্ধ হলো না! একমাত্র পুত্র মসৃণভাবে শিক্ষাজীবন শেষ করে বহুজাতিক সংস্থার পদস্থ ইঞ্জিনীয়ার। কর্মোপলক্ষে সে বাইরেই থাকে, তা-ও প্রায়ই বিদেশে, বছরে এক-দুবার তাকে কাছে পাই। ঐ কটা দিন কি আনন্দে যে কাটে! মাত্র কটা দিন! মনে হয় যাকে একদিনও চোখের আড়াল করতে পারিনি, ছোটো বাড়িতে তার অসুবিধা হয় এর জন্য নির্মমভাবে একাধিকবার সন্তান সম্ভাবনা নষ্ট করেছি, তাকে একা ফেলে কোনো আমোদ-অনুষ্ঠানে যাইনি, আজ যখন সে বাঞ্ছিত ঋদ্ধি ও সিদ্ধি পেয়েছে, তখন কেন আমার এই হা-হুতাশ! সে কি চিরকাল গৃহকোণে আবদ্ধ থাকবে? কেন আমার মনে হয় বাইরের জগতে দুটি সতর্ক চোখ তো তাকে সর্বদা পাহারা দিচ্ছে না! যদি অসুখ-বিসুখ বা অন্য কোনো বিপদ হয়! সেও সংসারী হতে যাচ্ছে—আমার স্বামীও তো এখন পিতামাতার স্নেহের

আশ্রয়ে নেই, আমাদের উভয়ের পিতাই স্বর্গগত হয়েছেন—মানুষ তো প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বাবলম্বী হতে শেখে। তবুও আমরা বুড়ো হলেও আমাদের সন্তান তো শিশুটিই থাকে। সেই শিশুটি আজ পরিণত যুবক হলেও আমরা দুটি নিঃসঙ্গ নরনারী আজও বিষণ্ণ স্মৃতিমেদুরতায় অর্থহীন সংসার-জীবন যাপন করে চলেছি। দুজনেই অসুস্থ, তবুও তার কথা ভেবেই এখনও স্বপ্ন দেখে চলেছি, কল্পনা এখনও রোমাঞ্চ হারায়নি, ভবিষ্যৎ এখনও দিশাহীন হয়নি, আমাদের সব পরিকল্পনা তো তাকে ঘিরেই! সে নিয়মিত বাবা-মায়ের খোঁজখবর নেয়, আমাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে, আমাদের তার কর্মস্থলে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমাদের অসুস্থতা তার কর্মজীবনের মসৃণতাকে ব্যাহত করতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা সেই ছোটো ভাড়া বাড়িটিতেই দিন কাটাচ্ছি, অর্থেব অপ্রাচুর্য নেই, তবুও কোনো বড়ো বাড়িতে সুস্থিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করি না। সেখানে শূন্য ঘর যে আমাদের বিড়ম্বিত করবে! এই সমৃদ্ধি যদি তার ছাত্রজীবনে তাকে দিতে পারতাম তবে আজ হয়তো চিন্তাধারার পরিবর্তন হতো। এখন সব কিছুতেই মনে হয়—কি প্রয়োজন? গাড়ি-বাড়ি তো অনায়সলব্ধ, কিন্তু অপ্রাপনীয় সংসার-সুখ কি সন্তানবিচ্ছিন্ন জীবনে আসতে পারে? আমার মা ও শাশুড়ির মতো আমিও ভাবি যেন ছেলেটিকে সুস্থ রেখে যেতে পারি। আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধব সবাই ভাবে আমার সংসারজীবন কী সুডৌল সৌকুমার্যে পরিপূর্ণ, আমি তো আছি সব পেয়েছির দেশে! আমি তাদের ভাবনায় বিচলিত নই—তারা যদি আমাকে সুখী ভেবে আনন্দ পায়, অথবা না-ই পায়, তাতে আমার অন্তর্লীন অনুভব অপরিবতির্তই থাকবে। কারণ এই অনুভব একান্তই আমার নিজস্ব, একে আমি লালন করে চলেছি সযত্নে, সস্নেহে, সতর্ক প্রহরায়। আমাদের এই সংসারে আমার সন্তানের কায়িক অনুপস্থিতি কি ভীষণভাবে তাকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে,

আমরা কীভাবে তাতেই কেন্দ্রিভূত হয়ে ঈশ্বর সাধনা করে চলেছি, এতে যদি কেউ আতিশয্যের ইঙ্গিত পান, তবে সেই আতিশয্য আমাদের লজ্জা নয়, অহঙ্কার। আমার সাদামাটা জীবনে এই অহঙ্কারটুকু না হয় থাকল, নইলে খ্যাপার মতো পরশপাথর খুঁজব কোথায়! ভবিষ্যতে এমনও তো হতে পারে আমার সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে কেউ নেই। আমার পরিবারকেন্দ্রিক আত্মকথন থেকে অনেকেই অনুমান করবেন তখন আমি শুধু বেঁচে থাকব হতাশা ও আত্মগ্লানির অন্ধকারে, যতদিন না মৃত্যু এসে আমায় মুক্তি দেয়। না, আমি তেমনটি হতে দেব না। এই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আমি তখন নিজের জন্য বাঁচব। সব রকম ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি সত্যিকারের স্বাধীনতা উপলব্ধি করব। আমার নিরলম্ব জীবন কিন্তু কখনোই রোমাঞ্চ হারাবে না। ইউলিসিসের মতো আমিও, বলব, 'I will drink life to the lees' অ-দেখা অচেনা দেশ, লোকজন, আমায় হাতছানি দেবে, পশুপাখি, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত আমার সঙ্গে কথা বলবে, তাছাড়া যাদের কেউ সমাদর করে না সেইসব এলেবেলে অসংখ্য ভারতবাসী, আমি তাদের কাছে যাব। বলব, আমি তোমাদেরই লোক, শুধু হারিয়ে গিয়েছিলাম অন্য এক দেশে। সেই দেশ আমাকে মুক্তি দিয়েছে, তোমরা কি আমাকে আপনার করে নেবে না? সবরকম বন্ধনমুক্ত আমি নিজেকে চিনব, জানব আমার নিজস্ব identity অন্য সাপেক্ষ নয়, আমাতেই আমি আছি আমার নিজস্ব অনন্যতায়। অন্যের চোখ দিয়ে যাকে দেখেছি, তাকে দেখব নিজের চোখ দিয়ে। চোখের আলো যদি নিভেও যায়, আমার অনুভূতির স্বজ্ঞালব্ধ আলোকে উদ্ভাসিত হবে আমার অন্তর-বাহির সব দিক। কার সাধ্য আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় আমার সেই অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টি? মানুষ যখন তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তখন কিন্তু তার বর্তমানই তার কল্পনার উপাদান জোগায়। আমাদের বর্তমানের

অসম্পূর্ণতাকে আমরা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পূর্ণতা দিয়ে ভরাট করে নিই। পূর্ণতা আমাদের আয়ত্তাধীন নয়—কিন্তু মানুষের কল্পনা তার অবাধ ডানা মেলে দিতে পারে ঐ আকাশে তার মুক্তির আলোয়। আমার ভবিষ্যতে সম্ভাব্য একক জীবনে আমি যে মহিমময়ীতে উত্তরণের কল্পনা করেছি, তার সঙ্গে আমার বর্তমানের নড়বড়ে পরনির্ভরশীল চরিত্রের সাযুজ্য কোথায়? কিন্তু যা Logically impossible তার বাস্তবতা ব্যক্তি মনের উপলব্ধিতে ভ্রান্ত নাও হতে পারে। আসলে সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি শুধু বাস্তব-অনুসারিতা নয়। কবি তাহলে লিখতেন না 'সেই সত্য যা' রচিবে তুমি'। আমার এই কল্পনা যদি ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন বা daydreamও হয়, তবুও তা অর্থহীন হবে না যদি আমার মনে ঐ স্বপ্নপূরণের তীব্র আকূতি থাকে। আমি দর্শনের ছাত্রী, Will-force-কে বিশ্বাস করি। মানুষের যেমন বিচারবুদ্ধি আছে, কল্পনাবিলাসও আছে। আজকের পৃথিবী অতীত মানুষের কল্পনায় থাকলেও থাকতে পারে। পুষ্পকরথ যখন আকাশে ওড়ে তখন কবির কল্পনা থেকে আজকের জেটযুগ শত যোজন দূরে। আমি কিন্তু আমার ভবিষ্যতের যে ছবিটি এঁকেছি, তা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, নিজের দুর্বলতাকে অতিক্রম করার আন্তরিক আকূতি। এই অতিক্রমযোগ্য অসম্পূর্ণতা কিন্তু আমাকে সর্বদাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে। আমি যা হতে চাই, তা হতে পারব না কেন? এখনও রয়েছে সময়, এখনও হয়নি বেলা শেষ।

আমি একটি আলোচনাসভায় একবার এক বিখ্যাত লেখকের মুখে শুনেছিলাম মেয়েরা ভালো লেখক হতে পারে না, কারণ তাদের চিন্তাধারা তাদের নিজেদের জগতেই সীমাবদ্ধ। তাই একটি মেয়ের আত্মজীবনী অতিব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দোষমুক্ত হতে পারে না, তার ভাবনা বহুজনের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে না। হয়তো ঠিক। কিন্তু যদি একটি মেয়ের চিন্তাধারার মধ্যে কয়েকটি মেয়েও আনুরূপ্য খুঁজে

পায়, যদি একজনের চোখের জল, মুখের হাসি অন্যতেও প্রতিফলিত হয়, তবে তো মেয়েটি আর একা নয়, সে তখন কয়েকজন। কারণ সে তো অন্য মেয়ের, অন্য বধূর, অন্য মায়ের হৃদয় ছুঁতে পেরেছে। অনুভূতির বিকেন্দ্রিকরণ কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে অন্য মাত্রা দেয়। নিজের সম্বন্ধে অত উচ্চ ধারণা আমার নেই, কিন্তু ব্যক্তির নিজের অনুভূতিও তো একটি উপলব্ধ সত্য, একটি বাস্তবতা, জাগতিক ঘটনাশৃঙ্খলের মধ্যে একটি ঘটনা, তাকে অবজ্ঞা করা গেলেও অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া মেয়েরা মেয়েদের মতোই থাক না, পুরুষ হয়ে ওঠার চেষ্টার মধ্যে নিজেদের হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমি নারীত্বের অবমাননা মনে করি।

THE AGONY OF A MOTHER

In the twitlight zone that I have reached,
The fading past is like 'an arch
wherethrough gleam's the memories
of days spent with you,
You, my child, my God, my World.

The new-born face that gave me the experience
of first ecstatic surprise of creation,
changed through the passing moments of time
into the handsome face of youth.
I enjoyed the change, at the same time felt,
I was no part of it,
it is all his own, his own world,
which he built up on the ruins of childhood.

And he enjoyed his own creation,
his freedom, his new acquaintances,
all his own, his very own world,
may be not so familiar, yet so fresh
that he loved to smell the fragrance,
rather than to mourn for the withering
flowers of a sheltered life.

This is the law of life.
This is the law of nature.
We are all in the game.

Still I wish you should never grow up
Because in me a mother sighs,
Yearning to get back what she has lost,
to take her child into the safety of her arms
wishing the time stand still at her will.

বিষণ্ণ বৈতান

আমার দুঃখিনী বোনটি যেমন একাকীত্বের দুঃসহ বেদনায় 'নিঃসঙ্গতার জার্নাল' লিখেছিল, আমার নিঃসঙ্গতায় আমি তেমন কোনো সৃজনধর্মী তাড়না অনুভব করি না। সে যে চোখের তমসায় দেখেছিল চোখের আলোকে, আমার সেই দিব্যদৃষ্টি কোথায়? আমার এই সাদামাটা জীবনে নিতান্তই আটপৌরে গৃহস্থালীর মধ্যে ধীরে ধীরে অপসৃয়মাণ আমার পূর্বজীবন কখনো কখনো বুকের মধ্যে বেদনা জাগায়, যেন কোনো গত জন্মের স্বপ্ন, যার অনুভূতি আছে, অথচ স্পষ্টতা নেই। তবুও সেইসব ছায়া ছায়া ছবি অনেকেই রয়েছে আশে-পাশে, কিন্তু তাদের বিশাল কর্মযজ্ঞে সদাব্যস্ততা আমাকে তেমন করে হয়তো মনে করায় না, যেমন করে মনে পড়লে আমার অহংবোধে আসত পরিপূর্ণতার তৃপ্তি। কিন্তু অপরিপূর্ণতায় আমি বিষণ্ণ হলেও আহত নই—কারণ পূর্ণতার পরে যে আর কিছু নেই। তারা ডাক দেবেই—আমি সেই প্রতীক্ষায় না হয় রইলাম। রোদ্দুরকে মুঠোয় ধরতে না পারলেও তার তাপ তো উপভোগ করছি।

সংসারে আমি প্রধানত দুই ধরনের সমাজসেবী দেখেছি। একদল যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমাজসেবা করেন, কোনো বিপদ

বাধাকে গ্রাহ্য করেন না, এঁরা সমাজসেবাকে ধর্ম মনে করেন, যার স্বতঃমূল্য বা intrinsic value আছে। এঁদের সমাজসেবার স্বীকৃতি এঁদের জীবদ্দশায় প্রায় মেলে না। কারণ এঁরা প্রচারের আলোয় আসতে চান না. এঁরাই আমাদেব নমস্য, যেমন মহেশ ও সরিতা।

আরেকদল সমাজসেবী উচ্চকোটির লোক, প্রধানত ধনী গৃহিণী, প্রখ্যাত শিল্পপতি বা উচ্চ পদাধিকারীর প্রদর্শনযোগ্য স্ত্রী বা আত্মীয়া, অথবা স্বগুণেই খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন মহিলা। গৃহকর্ম দাসদাসী নির্ভর, সন্তান প্রতিপালনও অন্যসাপেক্ষ, অবসরের আলস্যে এঁরা সমাজসেবা করে আত্মতৃপ্ত হন।

শব্দগাঁও

[নিঃস্বার্থ সমাজসেবী মহেশ ও সরিতার রক্তে রাঙা বিহারের অখ্যাত শব্দগাঁও আজ একটি নাম, একটি অনুপ্রেরণা]

দু'টি মানুষ—মহেশ ও সরিতা,
মাফিয়া-লাঞ্ছিত গাঁয়ের মানুষগুলিকে
বাঁচতে শিখিয়েছিলেন অকুতোভয় স্বনির্ভরতায়,

শ্রমদানে খাল-বিলের সংস্কার,
নিজেদের প্রাচীন পথ ধরে,
এনে দিল সমৃদ্ধির জোয়ার।
নামহীন তুচ্ছ গাঁয়ের মানুষগুলি,
নতুন করে ফিরে পেল মানুষের সম্মান।

মহেশ ও সরিতার রক্তে রাঙা
'শব্দগাঁও আজ একটি নাম।
একটি নিঃশব্দ বিপ্লব,
একটি নতুন ইতিহাস।
সহস্র শব্দগাঁও অঙ্কুরিত হোক ভারতের মাটিতে মাটিতে,
পাপাচারের ক্লেদমুক্তি থেকে জন্ম নিক নতুন পুণ্যভূমি।

আবিষ্কার

স্বেচ্ছানিবেদিতা সমাজসেবিকা আমি,
একেবারে আগমার্কা—বিশুদ্ধতায় ষোলোআনাই খাঁটি,
সরকারি তো নই—যে হাজারো রকম বিচ্যুতি,
চোরাপথে টাকার লেনদেন,
এইসব অবিশ্বাসী অপ্রত্যয়ী ব্যাপারে,
কলঙ্কিত হ'ব আমি অগ্নিশুদ্ধা ব্রতচারিণী।

আমার সুন্দর মুখ সস্নেহ উদ্বেগে,
খুঁজে বেড়ায়—
বেচারা পথশিশু, হতভাগিনী জবালাবাহিনীকে,
ওরাই যে আমার সমাজসেবার
অজস্র সুলভ উপচার।
ওদের উদ্ধারে আমার এই ছদ্মবেশ,
নিভৃতে উপভোগ করি,
মদিরা-জারিত নৃত্যসঙ্গীর কামসিক্ত বাহুবন্ধনে।

আমার 'নিপুণসেবা' দিয়েছি উজাড় করে যথাস্থানে,
বহুজাতিকের কর্ণধার ক্লীব পতিদেবতাকে,
দিয়েছি সাজানো সুন্দর সংসার,
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সপ্রতিভ সন্তান।
সতীধর্ম পালন করেছি আমি,
সুচতুর পারিপাট্যে।
সভা-সমিতি, সেমিনারে আমার মেধার
উজ্জ্বল বিভায় মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাকুল।
আমার সুকৌশলী জনসংযোগ, সুমধুর আপ্যায়ন,
হয়নি ব্যর্থ বিফল।
খবরের শিরোনামে আমি দেবদূতী ভারতবাসিনী।

আয়নার মুখোমুখি অব্যাজমনোহরা আমি,
চমকিত বিস্ময়ে দেখি রঙ্গিনী বসন্তসেনাকে।

শব্দব্রহ্ম

কিছুদিন আগে Discovery চ্যানেলে একটি অভিনব ঘটনার বিবরণ শুনেছিলাম। দশবছর যাবৎ ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি হাসপাতালে 'কোমায়' আচ্ছন্ন এক মহিলা হঠাৎ চেতনা ফিরে পেয়েই বিশুদ্ধ মার্জিত ব্রিটেনীয় ইংরেজি বলছেন। অথচ আগে তিনি কখনো ইংল্যান্ডে পা রাখেননি, ইয়াঙ্কি ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথাও বলেননি। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ঘটনাটিকে 'Foreign accent Syndrome' বলে উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারটি আমার কাছে আদৌ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। ভাষা ভাবপ্রকাশের একটি মাধ্যম। ধ্বনি অর্থযুক্ত হয়ে ভাষার রূপ নেয়। মানুষ যখন বাঙ্ময় হয়নি, তখনও সে ধ্বনির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করত। এই ধ্বনির মধ্যে একটা আনুরূপ্য খুঁজে পাওয়া যায়। শিশু জন্মের পরে সবথেকে প্রিয় সবথেকে আপন রূপে নিজের মা-কে দেখে। মাকে ডাকার জন্য সে যে সমস্ত ধ্বনি করে সেইগুলি অধিকাংশ ভাষাতেই (আমার ভিন্ন ভাষার জ্ঞান খুবই সীমিত) 'ম'বর্ণ বিবর্জিত নয়। 'মা', 'আম্মা', শিশুর অপরিস্ফুট মম্-মম্ ধ্বনির মধ্যেই অপ্রকটিত থাকে। আবার পিতার মধ্যে প-বর্গের প্রাধান্য। বাবা, আব্বা, পাপা ইত্যাদি। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু মা বোধহয় অনন্যা। মানুষ যে ইতরপ্রাণীর থেকে পৃথক, তার ভাষাতেই প্রমাণ মেলে। যে ভাষা আমরা বুঝি না, তার

বক্তব্যের tuneটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। শস্যক্ষেত্রে কর্মরতা মেয়েটির গানের বিষাদসুরটি কবি Wordsworth-এর বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নানা কারণে ভাষার বিবর্তন হয়। এই বিবর্তনে ভাষা তার সাংকেতিক রূপটি ক্রমশ হারিয়ে স্থানীয় একটি চেহারা নিয়ে কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের মেলামেশার মধ্যে অনিবার্য ভাবেই বিভিন্ন ভাষার মধ্যেও দেয়া-নেওয়া চলতে থাকে। এইভাবে ভাষাও সমৃদ্ধ হয়। এই মেলামেশা যতই বাড়বে মানুষের মূল ভাষাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বোধহয় একটা সার্বজনীন বোধগম্যতা অর্জন করবে। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই। কিন্তু এমনটি যদি হয় আমি খুশিই হব। হয়তো এটা আমার ইচ্ছাপূরণের একটা স্বপ্ন। অন্য ভাষার অজ্ঞানতা আমাদের কত অমূল্য সাহিত্য সম্পদের রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত রাখে! খুব সীমিত সংখ্যক অনুবাদেই আমরা মূল জিনিসটিকে ইম্প্রোভাইজ করতে পারি। কোথায় যেন বিদেশি বিদেশি গন্ধ! যদি আসল বস্তুটিকে আত্মসাৎ করতে না-ই পারি, তবে পাঠক হিসেবে নিজের অল্পজ্ঞতা খুবই পীড়াদায়ক হয়।

ধ্বনির প্রসঙ্গে একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ মনে আসছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, শব্দের মধ্যে আমি ওঁকার (অ+উ+ম)। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা বলতে পারবেন এই ধ্বনি সব ভাষার মধ্যে অন্তর্নিহিত কিনা। আমার যেন কেমন মনে হয় সব ধর্মের শাশ্বতবাণী বিভেদের প্রাচীর ডিঙিয়ে এক বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান দেয়। কারণ ধর্মও তো মানুষের সমাজজীবনেরই অঙ্গ। ধর্মের ভাষা মানুষেরই ভাষা। হয়তো ধর্মের প্রেক্ষিতে মানুষের ভাষা তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু সীমার মাঝেই যে অসীম, অন্তের মধ্যেই

যে অনন্তের হাতছানি! ধর্মে মানুষ তার অপূর্ণতাকে এক পূর্ণতার মধ্যে অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু ধর্মের ভাষা মানুষের কথ্যভাষা থেকে আলাদা নয়, যদিও ইঙ্গিতবাহী বা sign language রূপে তার অনন্যতা আছে।

ধর্ম ছাড়াও মানুষের সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকগুলি ভাষাসাপেক্ষ মানুষের চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে। যেহেতু মানুষের চিন্তাভাবনা তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত, অতএব এক অখণ্ড প্রকৃতি-সাম্রাজ্যের অধিবাসী হিসেবে মানুষের ভাষা কোথাও এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বাঁধা। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ভাষা আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়। রাজনীতির ভাষা, সমাজনীতির ভাষা, আইনের ভাষা, নৈতিকতার ভাষা আলাদাভাবে চিহ্নিত নয়। শুধু বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মানুষের ভাষা বিভিন্নভাবে অর্থবহ হয়। অবশ্য বিশেষ technical কতকগুলি শব্দ সীমিত ক্ষেত্রেই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এইগুলি তো পণ্ডিতের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা।

যদি আমরা ভাষার মিলের ব্যাপারে ফিরে যাই তবে সকৌতুকে আবিষ্কার করব সাহেবী বৃষ্টির Patter-patter আর বাঙালি বৃষ্টির টাপুর-টুপুর ধ্বনি সাম্যে বড়ো কাছাকাছি। ভাষা সম্বন্ধে মানুষ এতটাই সংবেদনশীল যে তার নিজের ভাষাকেই আবেগের অতিশয্যে সে সংরক্ষিত বস্তুর মতো আলাদা করে রেখেছে। ভাষা সম্বন্ধে আমাদের রক্ষণশীলতার, দাম্ভিকতার stigma-কে অতিক্রম করে যদি মানুষের মনকে ছুঁয়ে যেতে পারি তবে হয়তো দেখব—

'ভাষা এমন কথা বলে
বোঝে রে সকলে'—

ভাষার সেই 'কথা বলা'র অপেক্ষায় রইলাম।

মৃত্যুচিন্তায়

আমার মৃত্যুতে কোনো রোগশয্যা থাকবে না,
আমি হ'ব ইচ্ছা-মৃত্যুর অহংকার।
ক্লান্ত প্রতীক্ষায় প্রিয়জনদের শুষ্ক চোখের
মরুভূমি দেখতে চাই না আমি।
তাদের সজল স্নেহে প্লাবিত হোক আমার যাত্রা-পথ,
তরল মসৃণতায় ভেসে যাব নির্ভার কায়াহীনতায়।
আমার শেষ চেতনায় পৃথিবীর মাটির গন্ধ
মিশে থাক সুঘ্রাণ আশ্লেষে।

পরিবারকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে আমিও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছি।

ভাব-প্রকাশের জড়তা আমার এই চিন্তা-ভাবনাকে ব্যাপ্তি দিল না।

হয়তো ভবিষ্যতে আরো একটু সাহস সঞ্চয় করে আরো কিছু লিখব।

আপাতত আমার না-বলা কথা আমার মনের মধ্যেই লালিত হচ্ছে।